যোগনাথ

একটি চিত্র

চারুমুদ্রণ যন্ত্রে

৪৮ নং বিডন ষ্ট্রীট—হেদুয়ার উঃ পঃ কোণ

কলিকাতা

শক ১৮১৩

মূল্য ।৵৹ আনা মাত্র

উৎসর্গ পত্র।

জীবনের বন্ধুর পথে, দুর্দ্দিনে, যাঁহার অতুল স্নেহ অবসন্ন প্রাণে কত সময় বল সঞ্চার করিয়াছে, তাঁহারই শ্রীচরণে ভক্তিভরে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ উৎসর্গীকৃত হইল।

গ্রন্থকারের নিবেদন।

যোগনাথ প্রকাশিত হইল। কিন্তু যোগনাথ কি? —এ বিষয়ে দু'একটি কথা বলা আবশ্যক। যোগনাথকে কেহ কেহ উপন্যাস বলিতে পারেন। তাহাতে গ্রন্থকারের বিশেষ আপত্তি নাই, তবে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। ইহাতে উপন্যাসের একান্ত প্রয়োজনীয় কতকগুলি বিষয়ের অভাব আছে,—ইহাতে নায়িকা নাই, ঘটনা-বৈচিত্র্য নাই, চরিত্র-বৈচিত্র নাই, সমাজ-চিত্র নাই। তবে ইহাতে আছে কি?

মানব জীবন বড়ই জটিল। সাধারণতঃ ইহার দুটি দিক। একটি দিক সর্ব্বদাই লোক-চক্ষুর সমক্ষে প্রকাশিত,—এটি কার্য্যের দিক। আমাদের সমস্ত কার্য্য-কলাপ সকলেই দেখিতে পান ও তৎসম্বন্ধে সকলেই আপনাপন মতামত গঠন করিতে পারেন। অন্যপক্ষে আমাদের জীবনের অপর দিকটি সর্ব্বদাই লোক-চক্ষুর অন্তরালে থাকে।

ইহার সহিত লোক সাধারণের কোন সম্বন্ধ নাই, অন্ততঃ যতক্ষণ না তাহা কার্য্যে প্রকাশিত হয়। কিন্তু ইহাই আমাদের প্রকৃত জীবন। এই অন্তর-রাজ্যে অহর্নিশি যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়া থাকে, তাহারই উপর আমাদের জীবনের প্রকৃত শুভাশুভ নির্ভর করে। যোগনাথের জীবনে গ্রন্থকার এই জীবনের কয়েকটি অধ্যায় বর্ণন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, পাঠকেরাই বিবেচনা করিবেন। যোগনাথের জীবন ভ্রান্তিশূন্য নহে, সেরূপ কখন হইতেও পারে না। তবে একটি অপূর্ণ জীব পূর্ণতার আদর্শ হৃদয়ে ধারণ করিয়া জীবন-পথে চলিলে, সচরাচর অবস্থায় যেরূপ জীবন গঠিত হইবার সম্ভাবনা, তাহারই একটি চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে, ইহাতে সমস্ত জীবন-প্রশ্নের সদুত্তর দিবার চেষ্টা করাও হয় নাই, সাধ্যায়ত্তও নহে। সুতরাং সেরূপ প্রত্যাশা করিলে প্রতারিত হইবার কথা।

আমি বাল্যকাল হইতেই যোগনাথকে জানিতাম। যোগনাথ আমা অপেক্ষা প্রায় পাঁচ সাত বৎসরের বড় ছিলেন। আমি তাঁহাকে আপন বড় ভাইয়ের মতন দেখিতাম; তিনিও আমাকে আপন কনিষ্ঠের ন্যায় স্নেহ করিতেন। তাঁহার চরিত্রে অনেকগুলি বিপরীত গুণের সমাবেশ হইয়াছিল। সাধারণতঃ তাঁহাকে লোকে অত্যন্ত উগ্র প্রকৃতির বালক বলিয়া জানিত। আমাদের দেশে যাহাকে সচরাচর 'ভাল মানুষ' বলে, তাঁহার মধ্যে সেরূপ কিছুই ছিল না। যেখানে তিনি ন্যায়ের অবমাননা দেখিতেন বা সেরূপ মনে করিতেন, সেখানে তিনি রাগে আত্মহারা হইতেন ও তাহার প্রতিবিধানে তৎপর হইতেন—দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনা কপ-

নও তাঁহার কোষ্ঠিতে লেখে নাই। ক্রীড়াস্থলে যদি কোন অন্যায়াচরণ দেখিতেন (যেরূপ প্রায়ই ঘটিত), কোন প্রকার প্রবঞ্চনা হইত, তিনি অমনই ঘৃণার সহিত সেস্থান পরিত্যাগ করিতেন। এজন্য প্রায়ই তাঁহার খেলা হইত না—তিনি আপন মনে একাকী ভ্রমণ করিতেন। তিনি ঠাট্টা বিদ্রূপের বড় ধার ধারিতেন না। এইরূপ নানা কারণে তিনি কোন বালকের সহিতই প্রায় মিশিতেন না। কিন্তু তিনি যাহাকে ভালবাসিতেন, তাহার সকল প্রকার অত্যাচার তাঁহার আদরের হইত। আধ খানা প্রাণ দিয়া ভালবাসা কাহাকে বলে, তাহা তিনি জানিতেন না; যাহাকে ভাল বাসিতেন তাঁহার সমস্ত প্রাণটা তাহার ইঙ্গিতের অধীন হইয়া পড়িয়া থাকিত। অতি শৈশবেই তাঁহার অনেকগুলি মানসিক শক্তি বিকশিত হইয়াছিল। তিনি সর্ব্বদাই কি ভাবিতেন, পথ চলিবার সময় উর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া অনন্যমনে চলিতেন। সময় সময় কাহারও সহিতই বাক্যালাপ করিতেন না, কিছুতেই ললাটের কুঞ্চিত ভাব যাইত না। এজন্য কেহ কেহ তাঁহাকে ভূতাশ্রিত বলিয়া

মনে করিত। তাই বলিয়া তিনি যে আমোদপ্রিয় ছিলেন না, এরূপ নহে। যখন তিনি আপন ক্রীড়া-সঙ্গীদের সহিত মিশিতেন ও কোনরূপ প্রতিকূল অবস্থা না ঘটিত, সে দিন ক্রীড়াতরঙ্গে তিনি আপনি মাতিয়া অপর সকলকেও মাতাইতে পারিতেন। এজন্য তিনি যেদিন খেলিতে যাইতেন সেদিন সকলেরই বড় আনন্দ হইত। এমন কি তিনি নিতান্ত শিশুদিগের সহিতও খেলায় তুল্যরূপে মাতিতে পারিতেন। বস্তুতঃ সকল বালকই তাঁহাকে ভয় ও সম্ভ্রম করিত।

যোগনাথ অত্যন্ত প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার প্রতিভা সূচের ন্যায় তীক্ষ্ণ ও তৈলের ন্যায় ব্যাপ্তিশীল। যে বিষয় তাঁহার চিত্তাকর্ষণ করিত তাহাই তিনি অনায়াসে আয়ত্ত করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি আপন প্রতিভার নিয়ম ভিন্ন অন্য কোন নিয়মের অধীন ছিলেন না। যখন যাহা তাঁহার ভাল লাগিত, তখন তাহাই তিনি অনন্য মনা হইয়া পাঠ করিতেন, সুতরাং অন্যান্য সমস্ত বিষয় উপেক্ষিত হইত। কাজেই শিক্ষক বা সহ-

পাঠীদের নিকট তাঁহার বড় একটা প্রতিপত্তি ছিল না। তিনিও লোকের নিন্দা প্রশংসার প্রতি বড় একটা ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। বলিতেন যে এতদুভয়ের মধ্যে জ্ঞান অপেক্ষা অজ্ঞতার অংশই অধিক। তাঁহার জ্ঞান-পিপাসা সাতিশয় বলবতী ছিল, এবং তিনি প্রাণপণে তাহার অনুসরণ করিতেন। এ কথা সাধারণতঃ কেহই জানিত না। আমাকে তিনি বাল্যকাল হইতেই স্নেহ করিতেন, তাই মধ্যে মধ্যে আমাকে অনেক কথা বলিতেন। অত্যন্ত বাল্যকাল হইতেই জীব ও জগতের উৎপত্তি ও পরিণতি, ঈশ্বর ও আত্মার অস্তিত্ব প্রভৃতি নানাপ্রকার কূটপ্রশ্ন তাঁহার অন্তরে উদিত হইয়াছিল,এবং এই সমস্ত বিষয়ের মীমাংসার জন্য তাঁহার মন সর্ব্বদাই কঠোর চিন্তায় ব্যাপৃত থাকিত। অতি শৈশবে তিনি বসিয়া বসিয়া কত স্বর্গ নরকের কল্পনা করিতেন, শাস্ত্র-বর্ণিত চতুর্দ্দশ লোকের কল্পনাতেই তাঁহার চিত্ত ডুবিয়া থাকিত। বয়োবৃদ্ধি সহকারে নানা সন্দেহ তাঁহার অন্তরে উদিত হইল। ক্রমে ক্রমে স্বর্গ নরক সরিয়া গেল এবং

ধর্ম্মের গভীরতর প্রশ্নে তাঁহার চিত্ত আন্দোলিত হইয়া উঠিল। তিনি এখন তাঁহার সমস্ত মানসিক শক্তি সেই তত্ত্বনিরূপণে নিয়োজিত করিলেন। তাঁহার অসাধারণ উদ্যম দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইতাম।

এক দিকে যেমন তাঁহার প্রবল জ্ঞান-পিপাসা, অন্য দিকে অপর একটি আকাঙ্ক্ষা তাঁহার হৃদয়ের উপর তুল্যভাবে রাজত্ব করিত। এ কথা, এমন কি তাঁহার বন্ধুবর্গের মধ্যেও সাধারণতঃ অবিদিত ছিল। তাঁহার হৃদয় অত্যন্ত প্রেমপ্রবণ ছিল, কিন্তু এ প্রেমে মলয়ের স্নিগ্ধতা ও কুসুমের কোমলতা কত-টুকু ছিল বলিতে পারি না, তবে আগ্নেয়গিরির গর্ভাগ্নি মধ্যে মধ্যে বাহির হইয়া পড়িত। সমস্ত মন প্রাণ সম্পূর্ণরূপে অন্যের করিয়া দেওয়াই সে সর্ব্বগ্রাসী প্রেমের লক্ষণ ছিল। তাঁহার প্রেমের ভাষা তাঁহার প্রেমপাত্র এবং ভগবান্ উভয়ের প্রতি তুল্যরূপে প্রযোজ্য হইতে পারিত। ইহার কারণ, যখন যে ভাব তাঁহার প্রাণের উপর আধিপত্য করিত, তখন তাহাতেই তাঁহার সমস্ত মন প্রাণ

ডুবিয়া যাইত। কিশোর বয়সে তিনি একটি সমবয়স্কা বালিকার প্রেমে মাতিয়াছিলেন। কিন্তু যে কোন কারণেই হউক তাঁহার প্রাণের বাসনা পূর্ণ হইল না। সে সময়কার তাঁহার নৈরাশ্য-পীড়িত হৃদয়ের অবস্থা দেখিয়া আমার প্রাণে অশেষ যন্ত্রণা হইত। এক দুঃখ তাঁহার সমস্ত জীবন গ্রাস করিয়া ফেলিল। তাঁহার কর্ম্মকলাপ সমস্তই বন্ধ হইল, অতি সাধের বইগুলির আর যত্ন রহিল না। তিনি বিষণ্নমুখে, উন্মত্তহৃদয়ে বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন। আমার বড়ই আশঙ্কা হইত, এজন্য অনেক সময়ই আমি তাঁহার নিকট যাইয়া বসিয়া থাকিতাম। এমন কি তিনি আমার সহিত পর্য্যন্ত কোন কথা কহিতেন না। কিন্তু এ দুঃখ তাঁহার অপরিসীম শক্তিকে চূর্ণ করিতে পারিল না, তিনি শোক জয় করিলেন। আবার শান্তি আসিল, কিন্তু এবার এই গভীর দুঃখে নিষ্পিষ্ট হইয়া তাঁহার প্রকৃতির গভীরতা সমধিক বর্দ্ধিত হইল। এই সময়ে এক দিন আমি তাঁহাকে প্রেমের কারণ ও প্রকৃতি জিজ্ঞাসা করি, তাহাতে

তিনি বলেন—“দেখ ভাই, আমার জ্ঞান নিতান্ত সামান্য, তবু যাহা বুঝি বলিতেছি। প্রেমকে একটি সামান্য মানবীয় সম্বন্ধ বলিয়া আমার বোধ হয় না। আমরা সচরাচর মানুষে মানুষে যত বিভিন্ন বলিয়া মনে করি, বাস্তবিক তাহা নহে। বাহিরে আমরা পৃথক হইলেও মূলতঃ সমস্ত মানবই, সমস্ত মানব কেন—সমস্ত জগতই—এক। একই অনন্ত আত্মা সকলের অন্তরে থাকিয়া আমাদিগকে জীবিত রাখিয়াছেন, বস্তুতঃ তিনিই আমাদের সকলের প্রকৃত আত্মা। সেই অসীমের মধ্যে সীমা পড়িয়া জীবের সৃষ্টি হইয়াছে। সেই অসীম আত্মা আপনাকে সসীমে হারাইয়া পুনরায় আপনাকে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছেন। ইহাতেই প্রেমের উৎপত্তি। প্রেমে সসীম সসীমের অন্বেষণ করে না। কিন্তু অসীম আপনিই আপনার অন্বেষণ করিতেছেন। অসীম সসীমের রাজ্যে পড়িয়া আপনার অনন্ত জ্ঞান হারাইয়াছেন। তাই যখন আমার অন্তরস্থ অসীম তোমার মুখে আপনার সংবাদ প্রাপ্ত হন, তখনই তোমার সৌন্দর্য্যে আমি মুগ্ধ হই,

তোমার প্রতি আমার প্রেমোদয় হয়। এই প্রেমের সাহায্যে সসীম আপন সীমা ঘুচাইয়া অসীমকে লাভ করে। অনন্তবিস্তৃতিশীল আদর্শ এই অনন্ত প্রেমের পথ প্রদর্শন করিতেছে। প্রেম প্রকৃত প্রস্তাবে ধর্ম্ম।” তাঁহার কথা চিরদিনই আমার নিকট বেদবাক্য বলিয়া প্রতীত হইত। আমি তাঁহার এ সব কথা শিরোধার্য্য করিলাম। তাঁহার নৈরাশ্যের উন্মত্ততা হ্রাস হইয়া পুনরায় শান্তি স্থাপিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাঁহার চিন্তা-ভার কমে নাই, বরং বৃদ্ধিই হইয়াছে। তাঁহার মুখের চিন্তাজনিত বিষাদ দিন দিন আরও ঘনীভূত হইতে লাগিল,—যেন কোন দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা আবার তাঁহার হৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। এক দিন যাইয়া দেখি মুখ খানি আবার প্রসন্ন হই-য়াছে, বড় আনন্দ হইল, আমি হাসিয়া বলিলাম, “যা’ হউক, এ আকাশ যে কখনও পরিষ্কার দেখিব এরূপ আশা হয় নাই। এখন এই ভাবে চিরদিন থাকিলেই বাঁচি।” আমার কথায় সে মুখে একটু হাসি দেখা দিল। কিন্তু সে হাসি দেখিয়া বুঝি-

লাম, আমার ভ্রান্তি হইয়াছে। আমাকে বসিতে বলিলেন, আমিও বসিলাম। তিনি বলিতে লাগিলেন—"দেখ ভাই, আজন্ম সুখ শান্তি করিয়া জীবন কাটাইতেছি, কিন্তু যাহার অন্বেষণ করি, তাহা পাই না। লাভের মধ্যে দুঃখ ভার বাড়িতে থাকে। কি করিতে এ সংসারে আসিয়াছিলাম, আর কি করিতেছি—কিছুই ঠিক বুঝিতে পারি না। তবে এই পর্য্যন্ত জানি যে, যে জীবন যাপন করিতেছি ইহা প্রকৃত জীবন নহে। এইই যদি জীবনের শেষ পরিণাম হয়, তাহা হইলে এ জীবন রাখিবার কোন প্রয়োজন দেখি না। নিশ্চয়ই জীবনের স্বতন্ত্র লক্ষ্য আছে, অন্য পরিণাম আছে। আমি সেই জীবনের সন্ধানে বাহির হইব স্থির করিয়াছি।" আমি বলিলাম, " সে জীবন কি, তাহা ঠিক হইয়াছে কি? তাহা কোথায় মিলিবে ও কি উপায় অবলম্বন করিলে মিলিবে তাহা আগে স্থির না হইলে অন্বেষণে কোন ফল ফলিবে কি? অনিশ্চিতের আশায় কোথায় যাইবেন?"

যো—"সত্য, আমি এখনও সে জীবনের কোন

সন্ধান পাই নাই। সত্য, আমি অনিশ্চিতের সন্ধানে বাহির হইতেছি। কিন্তু তুমি যাহাকে নিশ্চিত বলিতেছ, সে কি? তাহা কি মৃত্যুর জগৎ নয়? এ নিশ্চিত লইয়া আমি কি করিব? এখানে থাকিলে নিশ্চিত মৃত্যু, তদপেক্ষা কি জীবনের সন্ধানও অধিকতর প্রার্থনীয় নয়? যদি আমি কৃতকার্য্য হই, তাহা হইলে ত জীবন ও জনম সার্থক হইল। আর যদি নাই বা কৃতকার্য্য হইলাম, তাহাতেই বা কি? আমার কি লোকসান হইবে? এ দিকেও মৃত্যু, না হয় ওদিকেই মৃত্যু হইল। আমি বাস্তবিক এত নিরাশও নই। আমি সে দিন তোমাকে বলিয়াছিলাম, আমাদের হৃদয়ের সমস্ত গভীর আকাঙ্ক্ষার মূলে অনন্তের কার্য্য। যদি আমরা কখনও অনন্তের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে, অনন্ত প্রেমে অনন্ত সুখলাভ হইবে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যোগসাধন করিয়া অনন্তের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, এরূপ কথা আমাদের দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রে সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়।

আমাদের দর্শনশাস্ত্রও তাহা প্রমাণ করিতেছে। যদি তাঁহারা কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন, তবে আমরাই বা না হইব কেন? যদি এ সংসারে কোন পন্থা থাকে যদ্দ্বারা সসীম হইতে অসীমে যাওয়া যায়, তাহা হইলে একাগ্রমনে অনুসন্ধান করিলে অবশ্যই মিলিবে।" আমি এ সমস্ত কথা শুনিয়াও আমার সন্দেহ প্রকাশ করিলাম। কিন্তু তিনি তখন মনস্থির করিয়াছেন। কে তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবে? তিনি আমাকে প্রতিশ্রুত করাইয়া লইলেন যে এ কথা আমি কাহারও নিকট প্রকাশ করিব না। কয়েক দিনের মধ্যেই যোগনাথ নিরুদ্দেশ হইলেন। তাঁহার অনেক অনুসন্ধান হইল, কিন্তু কেহই তাঁহার কোন সংবাদ পাইল না।

২

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার প্রায় পাঁচ বৎসর পরে আমি একবার পশ্চিমে বেড়াইতে যাই। আমি অনেক স্থানে ভ্রমণ করিয়া গয়ায় যাইয়া উপস্থিত হইলাম। আমি যখন পশ্চিমে যাই, সে সময়েই একবার যোগনাথের অনুসন্ধান করিবার সংকল্প করিয়া বাহির হই। আমি যেখানে সন্ন্যাসীর কথা শুনিতাম, সেখানেই যাইতাম; কিন্তু কোথায়ও যোগনাথের সন্ধান পাইলাম না। গয়াতে অনেক সন্ন্যাসী আছেন শুনিয়া আমি প্রায়ই পাহাড়ে পাহাড়ে বেড়াইতে আরম্ভ করিলাম। এক দিন সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে একটি প্রান্তরে বৃক্ষতলে একটি সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইলাম। করতলে কপোল ন্যস্ত করিয়া তিনি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। তাঁহাকে

দেখিয়াই আমার প্রাণে আশার সঞ্চার হইল। যোগনাথও চিরকাল চিন্তাকালে ঐ ভাবে বসিয়া থাকিতেন। আমি নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইলাম, তিনি আমাকে চিনিতে পারিলেন না। তাঁহারও চেহারা এত পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে যে চেনা কষ্টকর, কিন্তু আমার পূর্ব্বাপর সংস্কার ছিল বলিয়া আমি চিনিতে পারিলাম। আমি তাঁহাকে প্রণাম করিলাম, তিনি আমাকে বসিতে বলিলেন। আমি তখন জিজ্ঞাসা করিলাম, "দাদা, আপনি আমাকে চিনিতে পারিতেছেন না?" তিনি বিস্মিত হইয়া আমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন, পরে বলিলেন,—"কে? অ—?" তখন নানা কথা হইতে লাগিল। অবশেষে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "দাদা, যে জীবনের অনুসন্ধানে বাহির হইয়াছিলেন, এত বৎসর ধরিয়া যাহার অন্বেষণ করিলেন, তাহা লাভ হইয়াছে কি?"

যো—"ভাই, পরাজয় স্বীকার করিতে লজ্জা কি? তোমাকে আনুপূর্ব্বিক সমস্তই বলিতেছি। আমি যখন গৃহের বাহির হইলাম, তখন সমস্তই

অকূল সমুদ্র বলিয়া মনে হইল। কোথায় যাইব, কি করিব,—কিছুই স্থির ছিল না। তখন সাধুজনের সাক্ষাৎ লাভ করিবার জন্য তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। কত সাধক, কত সন্ন্যাসীর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিলাম,—কত ভণ্ডামী, কত বীভৎস কাণ্ডই দেখিলাম,—তাহার ইয়ত্তা নাই। অবশেষে প্রায় এক বৎসর পরে আমি একটি প্রকৃত ধর্ম্মপ্রাণ সাধুর সাক্ষাৎকার লাভ করিলাম। আমি তাঁহার নিকট সাধনপ্রার্থী হইলাম, তিনিও আমাকে মন্ত্রদান করিলেন। আমি এই ভাবে সাধনে প্রবৃত্ত হইলাম। প্রথম প্রথম কত আশাই প্রাণে জাগিয়া উঠিল, দিন দিন যেন নূতন রাজ্যে যাইতে লাগিলাম, দিন দিন বিশ্বাস বাড়িতে লাগিল। গভীর বিশ্বাসের সহিত অদম্য উৎসাহে সাধন করিতে লাগিলাম। আমার যত্ন, আমার উৎসাহ ও আমার সাধনোন্নতি দেখিয়া আমার গুরু সাতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিলেন। তাহাতে আমার আশা আরও বাড়িয়া গেল। কিন্তু শুদ্ধ আশা বাড়িলে কি হইবে? অনুসন্ধিৎসা বৃত্তি আপন কার্য্য করিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে

সন্দেহের উদয় হইতে লাগিল। আমি তখন মনে করিতাম, সাধনে আর একটু অগ্রসর হইলে জ্ঞানের আলোকে সন্দেহ চলিয়া যাইবে। এই ভাবে তিন বৎসর কাটিয়া গেল। কিন্তু সন্দেহ আর কাটে না, বরং ঘনীভূত হইতে লাগিল। ক্রমশঃ দেখিতে পাইলাম যে, জ্ঞানচক্ষু আবরিত করিয়া রাখিতে পারিলে ভাবের স্রোতে গা ঢালিয়া দেওয়া যায় বটে এবং তাহাতে সুখও আছে সন্দেহ নাই; কিন্তু যাহা চাহি তাহা কোথায়? এই ভাবুকতার সুখের আশায় কি আত্মীয় বন্ধু ত্যাগ করিয়া বনে আসিয়াছি? তখন হইতেই আমার চিন্তা ভিন্ন পন্থাবলম্বী হইল। এ কি পরশমণির অনুসন্ধান হইতেছে না? এখন আমার মনে হয়, এ ভাবে ভগবানের অন্বেষণ কখনই ফলবতী হইতে পারে না। যে দর্শন শাস্ত্রের উপর এ প্রকার সাধন প্রণালীর ভিত্তি স্থাপিত, তাহাই ভ্রান্ত। ভ্রান্তিতে যাহার উৎপত্তি, তাহা কখনই সত্যে লইয়া যাইতে পারে না। অনন্ত ব্রহ্মকে অতি-জাগতিক কল্পনা করাতেই এরূপ ভ্রান্তি হইয়াছে। এ প্রণালী অনুসারে এ জগৎটা

ভ্রান্তিতেই উৎপন্ন, সুতরাং সৃষ্টি বিলোপ করিতে না পারিলে কখনই পরমার্থ লাভ হইবে না।”

আমি অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, “সৃষ্টি বিলোপ? সে কি কথা?”

যো—“এ কথা বুঝিতে হইলে হিন্দুদর্শনানুযায়ী সৃষ্টিতত্ত্ব একটু জানা আবশ্যক। সচরাচর মায়াবাদ বলিতে লোকে বুঝে যে আমরা যাহা কিছু দেখিতে পাই সে সমস্তই মিথ্যা, স্বপ্নদৃষ্ট প্রহেলিকা মাত্র। মায়াবাদ সে কথা বলে না। দর্শনশাস্ত্রে স্বপ্নের সহিত জগতের যে তুলনা করা হইয়াছে, তাহা স্বতন্ত্র। জীব ও জগৎ একত্রেই সৃষ্ট, সুতরাং জীবের ইচ্ছা বা অনিচ্ছার উপর জগতের অস্তিত্ব নির্ভর করে না। যখন ইহাকে স্বপ্ন বলা হয়, তখন জীবের স্বপ্ন বুঝিতে হইবে না—মূল- বা আদ্যা-শক্তির স্বপ্ন বুঝিতে হইবে। হিন্দুদর্শনমতে জীবত্ব বোধই ভ্রান্তিপ্রসূত। সুতরাং যখন সে ভ্রান্তি ঘুচিয়া যায় তখনই জীবের মুক্তি হয়, তখনই সে জীবের পক্ষে সৃষ্টির বিলোপ হয়, জীব আপন সীমা ঘুচাইয়া অনন্তত্ব লাভ করে। ইহার নামই নির্ব্বাণমুক্তি।

এই সৃষ্টি-বিলোপ প্রকরণই যোগসাধন। পুরুষ ও প্রকৃতি হইতেই জগতের উৎপত্তি। পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়েই অনাদ্যনন্ত। প্রকৃতি নিয়ত-পরিণামী, কিন্তু পুরুষের কোন প্রকার পরিণাম নাই; অথচ তাঁহারই সান্নিধ্যহেতু প্রকৃতিতে পরিণাম হইতেছে। এবং এই পরিণাম হইতেই জগতের উৎপত্তি। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—প্রকৃতির এই তিন গুণ এবং এই তিন গুণ হইতেই সৃষ্টির বৈচিত্র্য। যখন এই তিন গুণ সমভাবে বর্ত্তমান, তখন প্রকৃতি নির্ম্মল; ইহাকেই পরাপ্রকৃতি বলে। যখন এই গুণত্রয়ের বৈষম্য হইতে লাগিল তখন সৃষ্টি আরম্ভ হইল। এই পরিণাম নিম্নাভিমুখী,—নির্ম্মল হইতে মলিন, মলিন হইতে মলিনতর ও মলিনতম। বুদ্ধি বা মহৎ, অহঙ্কার, মন ও পঞ্চতন্মাত্র—এইরূপ ক্রমিক পরিণাম এবং এই পরিণামের চরম ফল জীব ও জগৎ। নির্ম্মল পরা-চৈতন্ত এই অষ্ট প্রকার বিকার বা বন্ধনের ফলে জীবরূপী হইয়াছেন। জীবকে আপন প্রণষ্ট নির্ম্মলতা লাভ করিতে হইলে, এই অষ্ট বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে হইলে, এই নিম্নগামী

স্রোতকে ঊর্দ্ধগামী করিতে হইবে, অর্থাৎ পঞ্চতন্মাত্রকে মনে লয় করিতে হইবে, মনকে অহঙ্কারে, অহঙ্কারকে বুদ্ধিতে লয় করিতে হইবে। এক কথায় সৃষ্টি লোপ করিতে হইবে। এখানে আসিলে জীব ঈশ্বরত্ব লাভ করে। কিন্তু ইহাও মায়ার রাজ্য। সাধন বলে কেহ মায়ার অতীত রাজ্যে যাইতে পারে না। মায়ার রাজ্য হইতে মায়াতীত বা তূরীয় রাজ্যে যাইবার কোন পন্থা জ্ঞানমার্গ প্রদর্শন করে না। ভক্তি সাহায্যেই এই দুস্তর সাগর পার হইতে হইবে, ত্রিগুণের বৈষম্য দূর করিয়া পরাচৈতন্য লাভ করিতে হইবে। এইজন্যই ভক্তি শাস্ত্রের প্রবর্ত্তয়িতা শ্রীকৃষ্ণকে ত্রিভঙ্গ বলে।

"এ দর্শন শাস্ত্র একদেশদর্শী চিন্তার ফল। ইহাতে সমস্তই একই প্রাণহীন সমতাতে পরিণত হয়। তুমি সাধু কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছ, বা জ্ঞানালোচনায় ও সত্যের অন্বেষণে জীবনকে নিয়োজিত করিয়াছ—তাহাতে কি হইবে? যে স্বার্থসাধনে তৎপর রহিয়াছে, ইন্দ্রিয় সুখে আপনাকে পশুত্বে পরিণত করিয়াছে,—এ দর্শন শাস্ত্রের নিকট তাহারও

যে-অবস্থা, তোমারও তাহাই। সেও অষ্টবন্ধনে বদ্ধ, তুমিও অষ্টবন্ধনে বদ্ধ—তবে তাহার না হয় লৌহ শৃঙ্খল, তোমার না হয় স্বর্ণ শৃঙ্খল। মুক্তিপ্রার্থীর নিকট পাপ পুণ্য উভয়েরই মূল্য এক। তুমি জ্ঞানের উন্নতি দেখাইবে, সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি দেখাইবে, কিন্তু এ সমস্তই মায়ার বন্ধন, অবিদ্যার অন্ধকার তোমাকে আরও কঠোর রূপে আপন কারাগারে বদ্ধ করিতেছে। তোমার প্রাণ প্রেমে মাতিয়াছে? সাবধান! এ মায়ার বন্ধন। ইহা তোমাকে গভীরতর মায়ার কূপে ডুবাইতেছে।

"এক দিন ভাই, এসমস্তেতেই বিশ্বাস করিয়াছি, কিন্তু আজকাল আর বিশ্বাস হয় না। অনেক সময় অবাক্ হই, কিরূপে এসমস্ত বিশ্বাস করিয়াছিলাম।"

আমি বলিলাম, "আমিত তখনই বলিয়াছিলাম, অধ্রুবের আশায় ধ্রুব পরিত্যাগ করিলে পরিণামে অনুতাপ করিতে হইবে। এখন ত সমস্তই আলেয়ার আলো বলিয়া প্রমাণ হইল। অনর্থক জীবনের কয়েকটা মূল্যবান্ বৎসর নষ্ট হইল।"

যোগনাথ একটু হাসিয়া বলিলেন, "জীবনের মূল্যবান্ সময়! অনুতাপ! ঠিক অনুতাপ করিতেছি একথা বলিতে পারি না। আর জীবনের মূল্যবান্ সময় বৃথা নষ্ট করিয়াছি, একথা একেবারেই স্বীকার করিতে পারিনা। সময় ও শক্তি অপচয় করিয়াছি বলিয়া অনুতাপ করিব, না অন্যায় কার্য্য বলিয়া অনুতাপ করিব? আমি যদি এতদিন দেশে থাকিতাম, তাহা হইলে এতদপেক্ষা কোন্ মহত্তর কার্য্যে সময় কাটাইতাম? হয়ত কয়েক খানা পুস্তক অধিক পড়া হইত, হয়ত বা তজ্জন্য লোকের নিকট একটু বেশী প্রতিষ্ঠা লাভ হইত, কিন্তু আমি যাহা চাই তাহার কোন সুবিধা হইত কি? জীবনের সমস্যা পূরণ হইত কি? তবে কিসের জন্য অনুতাপ? ইহাতে অন্ততঃ এই এক সুখ আছে যে আমি সত্যের অন্বেষণ করিয়াছি। কৃতকার্য্য হই নাই, তাহা বলিয়া ক্ষোভ করিলে কি হইবে? আমি ক্ষোভ করিও না। আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি, এই আমার পক্ষে যথেষ্ট। পাছে নিষ্ফল হই এই আশঙ্কায় নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকা

অপেক্ষা চেষ্টাকরিয়া বিফল মনোরথ হওয়া কি সহস্র গুণে প্রার্থনীয় নহে? চেষ্টাই জীবন। আর যদি আত্মা অবিনাশী হয় তাহা হইলে অনন্ত কালের পক্ষে পাঁচ বৎসর কি? একটা ভুলকে ভুল বলিয়া জানাই কি যথেষ্ট নহে?"

ধন্য সত্যানুরাগ! ধন্য অধ্যবসায়! ধন্য তেজ! আমি অন্তরে শত শত ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। তখন জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখন গৃহে ফিরিবার ইচ্ছা আছে কি?" তিনি বলিলেন, "আমি আজই এইরূপ সংকল্প করিয়াছি।" তার পর তিনি আপন গুরুর নিকট চিরদিনের জন্য বিদায় লইয়া আমার সহিত গৃহে ফিরিলেন।

৩

যোগনাথ গৃহে ফিরিলেন, তাঁহার বন্ধুবান্ধব সকলেই সাতিশয় আনন্দিত হইলেন। তিনি পুনরায় সংসারের কাজ কর্ম্মে মন দিলেন, তাঁহার পরিত্যক্ত পুস্তক গুলির পুনরায় যত্ন হইল, বন্ধুবান্ধবের সহিত মিশিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু একটি ঘন বিষাদ সর্ব্বদাই তাঁহার ললাট দেশে বিরাজ করিত, ক্রমশঃ তাহা প্রকৃতিগত হইয়া গেল। তাঁহার সমস্ত আমোদ প্রমোদের মধ্যেও যেন একটু বিষাদের তান অনুভূত হইত। মধ্যে মধ্যে গভীর অবসাদ আসিয়া তাঁহার হৃদয় অধিকার করিত, তখন তাঁহাকে দেখিলে প্রাণে বড়ই যন্ত্রণা উপস্থিত হইত। সাধারণতঃ তাঁহার প্রাণে শান্তি ছিল। তিনি সর্ব্বদাই কাজ কর্ম্ম করিতেন, জীবনের কর্ত্তব্য কর্ম্মে

কথনও বড় অবহেলা হইত না। কিন্তু এ মৃত্যুর শান্তি। যথন মানুষের সকল আশা চলিয়া যায়, তখন যে প্রকার শান্তি স্থাপিত হয়, এ সেই শান্তি। যৌবনের সে অপরিসীম আশা, সে অদম্য উৎসাহ যেন কোথায় সরিয়া গিয়াছে। তিনি যেন সর্ব্বদা মৃত আশার সমাধিস্থলে বসিয়া শূন্য দৃষ্টিতে ভবিষ্যতের দিকে তাকাইতেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন, তাঁহার জীবনের কার্য্য শেষ হইয়াছে, তাঁহা হইতে আর কোন কার্য্য হইবে না। তাঁহার সমস্ত জীবনটাই বিফল চেষ্টার নিদর্শন। ভবিষ্যৎ তাঁহার জন্য কোন আশার কথা লইয়া আসিত না, অতীত কেবল পরাজয়ের কথাই বলিত। আশা মানুষকে কথনই পরিত্যাগ করে না, তাই তিনিও কথন কথন আশার মোহন সঙ্গীত শুনিতেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার বিশ্বাস হইত না; সুতরাং সে আশারও অর্দ্ধেক নিরাশা বই আর কিছুই নহে। তাঁহার প্রাণের অন্তর গভীর আকাঙ্ক্ষা—প্রেম—কথনই একেবারে নির্ব্বাপিত হয় নাই। যথন তাঁহার একটি আশা ধূলিসাৎ হইল, তথন ইহার

অভাব অনুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয় একটি দোসর খুঁজিত। তিনি বড়ই একা একা বোধ করিতেন। কত সময় বলিতেন, "আমার যৌবন চলিয়া গিয়াছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে যৌবনের আশা, উৎসাহ, বিশ্বাসও চলিয়া গিয়াছে। যদি একটিবার যৌবন ফিরিয়া পাইতাম, তাহা হইলে আবার নূতন করিয়া একবার খেলিয়া দেখিতাম।" প্রেম ও বিবাহের কথা হইলে কত সময় বিদ্রূপ করিয়া উড়াইয়া দিতেন, কখনও বা বলিতেন "ভাই, ভালবাসা কাহার প্রাণ না চায়? আমি যে এবিষয়ে উদাসীন তাহা নহি, বরং সে জন্য আমার প্রাণ ব্যাকুল। কিন্তু যাহা হইবার নহে, তাহার জন্য ব্যাকুল হইলে কি হইবে? আমি যাহা চাই, তাহা কি এ জীবনে মিলিবে? আমার যদি যৌবনের নবীনত্ব থাকিত তাহা হইলেও আশা করিতে পারিতাম, কিন্তু এখন আমার মনে হয়, আমার ভালবাসিবার দিন ফুরাইয়াছে। যে আত্ম-বিস্মৃতির ভাব থাকিলে আপনাকে ডুবাইয়া দেওয়া যায় সে ভাব আমার চলিয়া গিয়াছে, 'আমিত্বের'

বোঝা আমার ঘাড়ে বড়ই চাপিয়া রহিয়াছে। অনেক সময়ই এরূপ মনে হয় যে সমস্তটা প্রাণ দিয়া ভালবাসিবার শক্তি পর্য্যন্ত আমার লোপ পাইয়াছে।" এইরূপ তাঁহার জীবনের সকল বিভাগেই একটি ঘোর নৈরাশ্যের ভাব মাখিয়া গিয়াছিল। তিনিত আপন জীবন সম্বন্ধে এক প্রকার আশা করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন; আমি পর্য্যন্ত সময়ে সময়ে আশা পরিত্যাগ করিতাম।

এক দিন আমি যোগনাথের গৃহে যাইয়া দেখি তিনি শূন্যে দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া বসিয়া আছেন, সমস্ত শরীর নিস্পন্দ, যেন নিশ্বাস প্রশ্বাসও পড়িতেছে না, রক্ত চলাচল পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়াছে। চক্ষুতে একটা অপার্থিব গভীরতা প্রকাশ পাইতেছে, যেন এ সংসার হইতে তাঁহার দৃষ্টি সঙ্কুচিত হইয়া অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে। চক্ষু দুটি উন্মীলিত বটে, কিন্তু কোন বাহ্য পদার্থ যেন সে দৃষ্টির বিষয় নহে। চক্ষুর উজ্জ্বলতা কিছু মাত্র নাই, একটু ঘোলা ঘোলা—তথাপি তাহা দেখিলে বোধ হয় তাহাতে তেজ যেন কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। চিন্তার একাগ্রতা প্রভাবে ললাট

দেশ যেন প্রসারিত হইয়াছে। সে গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইলাম। গৃহে প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে একখানি আসন গ্রহণ করিয়া বসিলাম। তিনি আমাকে দেখিলেন, কিন্তু কোন কথাই কহিলেন না, আমিও তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না। এই ভাবে কিছুকাল বসিয়া থাকার পর তাঁহার মন জ্যা-মুক্ত ধনুকের ন্যায় ক্রমশঃ স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইল। ললাট আবার প্রসন্নতা লাভ করিল; দৃষ্টি পুনরায় বহির্মুখী হইল ; মুখের পেশীগুলি স্বাভাবিক শিথিলতা প্রাপ্ত হইল। তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আজ এ ভাবে কি চিন্তা করিতে ছিলেন ? আমার ত ঘরে ঢুকিতেই সাহস হয় নাই। তবে একটা জিনিস আপনাকে দেখাব বলে এসেছিলাম, তাই চুপি চুপি বসিয়া আছি।"

যো—"আচ্ছা, আমার কথা পরে হবে। তুমি কি দেখাবে দেখাও না। তোমরা হচ্ছ কবি লোক, তোমাদের ত কতই দেখাবার আছে।"

আমি বলিলাম, "বাস্তবিকই দাদা, আজ আপ-

নাকে কবিতা দেখাতেই এসেছি। আমি আর কাহারও কাছে কবি হই বা না হই, আপনার কাছে ত বটে।" এই বলিয়া তাঁহার হস্তে দুখণ্ড কাগজ দিলাম। তিনি স্থিরভাবে তাহা পড়িতে লাগিলেন। তখন তিনি বলিলেন, "বাস্তবিকই ভাই, তোমার প্রতি আমার হিংসা হয়।—বুঝ্‌লে ?"

"বোধ হয় বুঝেছি।"

"না ভাই, আমি ঠিক বলিনাই ; আমি তোমাকে হিংসা করিনা।"

"এবার আর কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, সকলই গোল হইয়া গেল। ভাল করিয়া প্রকাশ করিয়া বলুন।"

যো—"দেখ ভাই, যখন তোমাদের যৌবনোচিত ভাবের নবীনত্ব দেখি, হৃদয়ের কোমলতা দেখি, তখন আমার বড়ই প্রলোভন হয়। মনে হয়, যদি তোমাদের ন্যায় একটিবার সৌন্দর্য্যের মোহে মাতিতে পারিতাম! যদি তোমাদের ন্যায় একটিবার কোন বালিকার সুকুমার সৌন্দর্য্যে—যে সৌন্দর্য্য আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতাকে পরাভব করিয়া

ইথিরীয় রাজ্যে পলায়ন করে—সেই সৌন্দর্য্যে মাতিতে পারিতাম! যদি একটি কুমারী-হৃদয়ের পবিত্র সৌরভে বিভোর হইতে পারিতাম! তাই তোমার কবিতা দুটি পড়িয়া ও কথা বলিয়াছিলাম; কিন্তু তাহাতে যেন আমার বিবেকে আঘাত লাগিল। জীবন মাত্রই কি পবিত্র নয়? আমার জীবন যাহাই হউক, তাহা কি আমার নিকট অতি পবিত্র নহে? আমার জীবনের কি কোন লক্ষ্য নাই? এ জগতে কি ইহার কোন স্থান নাই? একথা বলিতে পারি না। এ কথা বলিলে জীবনের প্রতি বিদ্রোহাচরণ করা হয়। এতদপেক্ষা ঘোরতর নাস্তিকতা কি হইতে পারে? সত্য, আমি জীবন সংগ্রামে পড়িয়া অনেক হারাইয়াছি। যৌবন প্রলোভনীয়, তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। কিন্তু যৌবনত জীবনের সব নহে। যাহা আছে, তাহা কি অধিকতর মূল্যবান্ নহে? আমি এখন যাহা চাই, তাহা কি যৌবন আমাকে দিতে পারিত? তবে আমরা বড় সুখপ্রিয়, তাই এত অবিশ্বাস, এত অবসাদ উপস্থিত হয়। আমি আজ জীবনের পবিত্রতা

অনুভব করিয়াছি। তুমি যখন প্রথমে আসিয়াছিলে, তখন আমি যেন এ জগতে ছিলাম না। আমার প্রাণ যেন বহিরিন্দ্রিয় হইতে প্রত্যাহৃত হইয়া অন্তরের অন্তরে প্রবেশ করিয়াছিল। আমি যেন জীবনের মূল প্রস্রবণের অতি নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইয়া ছিলাম। তখন প্রাণ হইতে সমস্ত অবসাদ ও অবিশ্বাস চলিয়া গেল, নূতন আশা, নূতন বল প্রাণে সঞ্চারিত হইল। ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল ভাবে সম্মুখে প্রকাশিত হইল, জীবনের লক্ষ্য স্পষ্টই অনুভব করিলাম, যেন আমার কিছুই যায় নাই, অনন্ত জীবন সম্মুখে প্রসারিত। অনন্ত জীবনের জন্য অনন্ত উদ্যম, অনন্ত চেষ্টা আবশ্যক। অবসাদই প্রকৃত নাস্তিকতা। তখন মনে মনে বলিলাম, 'ভগবান্' তুমিই চিরমঙ্গল।

"ভাই, আজ বাস্তবিকই এত আশা প্রাণে জাগিয়াছে, যে সমস্ত জীবন ধরিয়া আদর্শের প্রতীক্ষা করিতে পারি। এ জগতে যাহার তুলনা হয় না, তাহা কি এক দিনে লাভ হইতে পারে? সে জিনিস যদি এত সহজলভ্য হইবে, তবে তাহার এত আদর

হইবে কেন? যাহা প্রকৃত জীবনপ্রদ, যাহা আমার পরম মঙ্গল, তাহা লাভের জন্য একটা জীবনকাল ধরিয়া প্রতীক্ষা করা কি এত কঠিন? চেষ্টা করা আমাদের সাধ্যের মধ্যে, শুদ্ধ তাই নয়—চেষ্টা করা আমাদের অবশ্যকর্ত্তব্য; কিন্তু ফল প্রাপ্তি কি আমাদের ক্ষমতার অধীন? সময় পূর্ণ হইলে ফল অবশ্যই আসিবে। এ বিশ্বাস না থাকিলে জীবনে দাঁড়াইবার স্থান কোথায়? ইহাই প্রকৃত ধর্ম্ম।

"ভাই, তুমি কিছু ভুল বুঝিও না। এতদ্দ্বারা আমি তোমার আদর্শের নিন্দা করিতেছি না; কিম্বা যে তোমার প্রাণের ভাবের পবিত্রতা আমি অনুভব করিতেছি না—তাহাও নহে। মূলতঃ এক হইলেও সকলেরই জীবন পৃথক্;—আদর্শ ও উপায় স্বতন্ত্র। যাহা এক জনের পক্ষে অমৃত, তাহা অন্যের পক্ষে গরল হইতে পারে। তুমি এখনও যুবক, যৌবনের অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী—প্রকৃতি আপন সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডার তোমার জন্য খুলিয়া রাখিয়াছেন। তুমি কেন তাহা সম্ভোগ করিবে না? যাঁহারা প্রকৃতই সৌন্দর্য্যের 'উপাসক',

তাঁহারা বাস্তবিকই স্বর্গের পথে দণ্ডায়মান। তবে যাহারা কেবল সৌন্দর্য্যের রসাস্বাদ করিয়া বেড়ায়, তাহাদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। ইহারা চিরকাল ধূলিতেই ভ্রমণ করে। প্রকৃত শিল্পী স্বর্গের সৌন্দর্য্য আনিয়া মর্ত্ত্যে প্রস্ফুটিত করেন। স্বর্গের অগ্নিতে তাঁহার পক্ষপূত, তাহা তাঁহাকে স্বর্গদ্বারে লইয়া যায়: আমি এখন বিগতযৌবন, আমার স্বতন্ত্র আদর্শ, আমার পক্ষে স্বতন্ত্র বিধি। তুমি তোমার 'আদর্শের' অনুসরণ কর, তাহাতেই তুমি জীবন লাভ করিতে পারিবে। আপন আপন জীবনের নিয়মের অনুগত হইয়া চলাই সকলের ধর্ম্ম, এতদপেক্ষা উচ্চতর কোন নীতি আছে কি না জানি না।"

আমি মুগ্ধের ন্যায় এ সমস্ত কথা শুনিলাম এবং জীবনের উচ্চতর আদর্শ ও নীতি হৃদয়ে ধারণ করিয়া গৃহে ফিরিলাম।

৪

এই দিন হইতে যোগনাথের জীবনে একটি নূতন পরিবর্ত্তন হইল। সমস্ত নিরাশার অন্ধকার জীবন হইতে চলিয়া যাইয়া এক নূতন আশা ও উৎসাহ প্রকাশ পাইতে লাগিল। নূতন উদ্যমের সহিত তিনি কাজকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন, নিরাশার কথা আর সে রসনা বলিত না। মুখমণ্ডলে একটি গভীর শান্তি যেন সর্ব্বদাই বিরাজ করিত। এত দিন যে কাজকর্ম্ম করিতেন তাহা কর্ত্তব্যবোধ-প্রসূত বলিয়াই প্রতীয়মান হইত, এখন সেস্থলে প্রকৃত অনুরাগ দেখা দিল। আরও কিছু কাল পরে আর একটী নূতন ভাব প্রকাশ পাইল। মুখে একটি সুন্দর প্রফুল্লতা সর্ব্বদা বিরাজ করিত, প্রত্যেক পদক্ষেপে যেন একটি অভিনব শক্তির

পরিচয় পাওয়া গেল, তাঁহার কণ্ঠস্বরে যেন একটি সুমধুর আনন্দের সুর ফুটিতে লাগিল। আমি একটু বিস্মিত হইলাম। এরূপ ভাব বহুকাল দেখিয়াছি বলিয়া বোধ হইল না। একি শুদ্ধ জীবনে আস্থার ফল? না, অন্য কোন সাধারণ মানবীয় কারণ বিদ্যমান? আমার নানা প্রকার সন্দেহ হইতে লাগিল। কিছু কাল পরে দেখিতে পাইলাম, ইহার মূলে প্রেম বর্ত্তমান। আমার বড় আনন্দ হইল। যোগনাথ এই ঘোরতর জীবনসংগ্রামের পর একটু সুখের আস্বাদ পাইতেছেন, ইহা দেখিলে কাহার না আনন্দ হয়? আমি যোগনাথের সুখে সুখী হইলাম। আমি তাঁহার প্রেমের পরিণতি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম। তিনি দিন দিন এ পথে অধিকতর অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যখন তাঁহাকে প্রেমের নানা প্রকার সংশয় ও ভয়ের দ্বারা দোলায়িত ও কম্পিত হইতে দেখিতাম, তখন আমার বড় আনন্দ হইত। তীর হইতে সমুদ্রস্থিত বাত্যাবিতাড়িত অর্ণবপোতের অবস্থা পরিদর্শন করা কি সুখকর নহে? এ সেই জাতীয় আনন্দ।

যাই হউক, আমি এক দিন ব্যঙ্গচ্ছলে তাঁহাকে বলিলাম, "কেমন দাদা, এখন বনে যেতে ইচ্ছা হয় কি?"

যো—(একটু হাসিয়া) "কেন, এখন আবার সে কথা কেন? বন জঙ্গলত অনেক কালই ছেড়েছি।"

আ—"আচ্ছা, সে যাক্। বন জঙ্গল চুলোয় যাক্। মানুষ ভাল লাগে কি? আকাশ, ফুল, পাখী ভাল লাগে কি? কোমল চোকের কোমল চাহনী ভাল লাগে কি?"

যো—"কেন? তা' আবার কার না ভাল লাগে? আমি কি কখনও এ সব ভাল লাগে না, এমন কথা বলেছি?"

আ—"আচ্ছা, নাই বলুন। যৌবনটা একেবারে চলে গেছে কি? ভাল বাসিবার শক্তি পর্য্যন্ত—?"

যো—"সে কি আর মিথ্যা কথা? যা হউক, এত বাগাড়ম্বর কেন?"

আ—"মরি! দাদা আমার যেন আর কিছু বুঝেন না? খোকা কি না!"

যো—"সোজা পথে চল্লেই হয়, আমিও সোজা

পথে চলি। আমি তোমাকে এত দিন কিছু বলি নাই। বলিবার বিশেষ কিছু ছিল কি? আকাশের চাঁদটা বড় সুন্দর। তা'দেখে যদি কাহারও ধর্তে ইচ্ছা হয়, তা' কি প্রকাশ করা উচিত? তবে তোমার সঙ্গে আমার স্বতন্ত্র কথা। তুমি আমার হৃদয়ের কোন্ কথাটাই বা না জান? তবু কি জানি এ কথাটা বল্তে ইচ্ছা হ'ল না—পাগ্লামি বলে বোধ হ'ল। জানইত, 'প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাৎ—' তাই বড় ভয় হয়। আর কি জান, আমার আপন হৃদয়ের প্রতিও যেন সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয় না। হৃদয় বিশুদ্ধ না হইলে কি কেহ এ পবিত্র ভাব হৃদয়ে ধারণ করিতে পারে? সুন্দর বস্তুর জন্য আকাঙ্ক্ষা এক, তাহা অনেকেই অনুভব করিতে পারে। কিন্তু প্রেম স্বতন্ত্র ভাব। Sir Galahad ভিন্ন কেহ কি Holy Grail লাভ করিতে সমর্থ হয়? তাই বড় আশঙ্কা হয়। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে সে চিন্তাতে এ মলিন হৃদয়ও পবিত্র হইয়া উঠে, কিন্তু ইহাতে আমার নিজের কি আছে? যে পবিত্র শক্তি প্রভাবে এরূপ হয় ইহা কি তাহারই

গৌরব প্রকাশ করে না? আমি ভালবাসি তা'তে আমার কি? ইহাকে যদি প্রেম বলিতে চাও বলিতে পার।"

তখন আমি বলিলাম, "প্রকৃত ভক্ত কখনও আপন ভক্তি দেখিতে পায় না, প্রকৃত প্রেমিকও আপন প্রেম বুঝিতে পারে না। একটি বৈষ্ণব সঙ্গীতের অর্থ আমি আজ ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম। 'সজনি, ব'লো নগরে, ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী কৃষ্ণ-কলঙ্ক-সাগরে।' প্রেমিকার মুখে প্রেম নাম আসিল না। তিনি মনে করেন, ইহা তাহার পক্ষে কলঙ্কমাত্র। সে যাই হউক, এখন তাঁর ভাব কিরূপ বুঝ্‌তে পারেন? তাঁ'রও কি আপনার মত প্রেমহীন ভাব?" এই বলিয়া আমি একটু হাসিলাম।

যো—, "তা' কেমন করে বল্‌ব? আমি কিছু তাঁ'র মনের মধ্যে প্রবেশ কর্ত্তে পারি না; তিনিও কোন কথা কখনও প্রকাশ করে বলেন নি। তবে একজন বন্ধুর প্রতি যেরূপ ব্যবহার হইতে পারে তাহাতে কোন ত্রুটী দেখি নাই। প্রাণের টান

যাহাকে বলে তাহা কখনও দেখি নাই বটে, তবে কোন প্রকার শৈত্য বা দূর দূর ভাবও কখনও প্রকাশ পায় নাই।"

আ—"তবু আপনার কেমন আশা হয়? শুনেছি, প্রেমিকের চক্ষু নাকি অন্তর্দর্শী; সাধারণ মানবীয় ভাষা ব্যতিরেকেও নাকি চক্ষুর ভাষা, বর্ণের ভাষা বুঝিতে সমর্থ। আমার ইচ্ছা হয়, আপনার মনের কথা আনুপূর্ব্বিক সমস্ত শুনি। কঠোর যোগসাধনার পর আবার কিরূপে এই কোমল ভাব জাগিল, শুনিতে বড়ই কৌতূহল হয়।"

যো—"তুমিত, ভাই, জানই এসব আশা আমার একেবারেই গিয়াছিল। কখনও যে আবার কাহারও একটু আদরও ভালবাসার জন্য এরূপ লালায়িত হইব, এরূপ আশা ছিল না। আকাঙ্ক্ষা গিয়াছিল যে তাহা নয়, তবে আশা ছিল না। আমাদের যখন প্রথম দেখা শুনা হয়, তখনও সেই অবস্থা। কিছুদিন আলাপ পরিচয়ের পর বিশেষ শ্রদ্ধা হইল। জ্ঞানের মধ্যে সরলতা, গাম্ভীর্য্যের

মধ্যেই একটু ক্রীড়াশীলতা, জীবনের সাধারণ কর্ত্ত-ব্যের মধ্যেই অনন্ত সৌন্দর্য্যের জন্য একটি চির-অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা—ইহা দেখিয়া আমি মুগ্ধ হই-লাম। একদিন আপন মনে বসিয়া আছি, কত কি চিন্তা আসিতেছে যাইতেছে, এমন সময় হঠাৎ সে ছবি খানি চোকের সম্মুখে উপস্থিত হইল। কি যেন এক সুখের হিল্লোলে প্রাণটা নাচিয়া উঠিল; শ্মশানের মধ্যে যেন অকস্মাৎ একটি স্বর্গের ফুল ফুটিয়া উঠিল। আমি মনে করিলাম এ ভ্রান্তি মাত্র, এ শুদ্ধ কল্পনা, এ প্রকৃতির কুহকজাল ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমি অন্তর হইতে সে ভাব দূর করিতে ব্যস্ত হইলাম। কেন আবার অসু-খের বীজ বপন করি? 'সুখ চেয়ে সোয়াস্তি ভাল' এই কথাই ভাবিতাম। কিন্তু আমি ছাড়িলে কি হয়, সে ছবি আমাকে ছাড়িল না। এই সময় হইতে যখনই আমি আপন মনে বসিয়া থাকিতাম তখনই কি যেন একটি সুমধুর, অথচ অস্পষ্ট তান হৃদয়ের মধ্যে শুনিতে পাইতাম। আপনিই হৃদয় মধুময় হইয়া উঠিত। পূর্ব্বে মনে করিয়াছিলাম,

যৌবন আমাকে ত্যাগ করিয়াছে; কিন্তু দেখিলাম, যৌবন আবার ফিরিল, হৃদয়ে দু'একটি করিয়া আবার ফুল ফুটিয়া উঠিল। ভাই, বলিতে আর লজ্জা কি, আমি আবার মেঘরাজ্যে সুখের ঘর বাঁধিতে লাগিলাম। কত কবিকল্পিত অবস্থার কল্পনা করিতে লাগিলাম। সময় সময় আমি আপনার অবস্থা দেখিয়া আপনিই হাসিতাম। মনে করিতাম, এ সব কি পাগলামি নয়? কিন্তু জ্ঞানের এ বিদ্রূপে প্রাণের আশা ভয় পাইল না। আশা আপন মনে সুখভবন প্রস্তুত করিতে লাগিল। কত সময় কত আশঙ্কা হয়, কিন্তু কি জানি কেন আশা বাড়িয়া গিয়াছে, আশঙ্কা আর স্থান পায় না। তোমাকে ত ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, আদর্শের জন্য এখন সমস্ত জীবন ধরিয়া প্রতীক্ষা করিতে পারি, তাহাতে আর ভয় হয় না।"

যোগনাথ এই ভাবে দিন দিন প্রেম প্রবাহে নিমজ্জিত হইতে লাগিলেন। তাঁহাদের সম্বন্ধ দিন দিন ঘনিষ্টতর হইতে লাগিল। সর্ব্বদা যেন তাঁহার চোকে মুখে আনন্দ ফুটিয়া পড়িত। যোগনাথ

আর একবার কৈশোরে প্রেমে মাতিয়াছিলেন। Love is love for evermore. আমার বড় সন্দেহ হইতে লাগিল। আমি ভাবিতাম, এ আবার কি? যোগনাথের হৃদয়ে আমার কখনও অবিশ্বাস হইত না। অথচ একই জীবনে দু'বার প্রেম, ইহাও বুঝিতে পারিতাম না। অন্য কাহারও সম্বন্ধে হইলে, অনায়াসেই ভাবিতে পারিতাম, তাহারা প্রকৃত প্রেম কি, তাহা জানে না। কিন্তু যোগনাথকে আদর্শ বলিয়া মানিতাম, কাজেই তাঁহার সম্বন্ধে সে মীমাংসা করিতে পারিলাম না। আরও তাঁহার নিকট প্রেমের যে গভীর ব্যাখ্যা শুনিতাম, তাহা আর কোথাও শুনি নাই। তাঁহার নিকটই শুনিলাম, প্রেম ধর্ম্ম। এ দিকে যোগ-নাথের প্রাণের ভাব প্রকাশ পাইল; ভাবে ভাব মিশিল; দুটি অনন্তাভিমুখী আত্মা অনন্তের পথে একত্র মিলিত হইল। আমি আর থাকিতে পারি-লাম না, এক দিন জিজ্ঞাসা করিলাম, "দাদা, একটি কথা আমাকে বড় সন্দেহের মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছে। কিছু যদি মনে না করেন, তাহা হইলে বলি।"

যো—"তা আবার কি? বলেই ফেল না। যা' মনে হয়েছে তা' আবার বল্‌তে কি? এখনও কি অবিশ্বাস হয়? আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে তোমার আবার ভয়ের কারণ কি?"

আ—"চিরকাল শুনিয়া এসেছি, প্রেম অনন্ত। প্রেমের ক্ষয় নাই। প্রকৃত প্রেম একবার হইলেই তাহা চিরস্থায়ী। তাহা হইলে কি এ জীবনে দু'বার প্রেম হয়?"

যো—"তুমি যে কথা উত্থাপন করিয়াছ, তাহা অত্যন্ত স্বাভাবিক। এরূপ সন্দেহ হইবারই কথা। প্রেম যে অনন্ত, সে বিষয়ে কি কিছুমাত্র সংশয় আছে? ইহার অনন্তত্ব কি শুদ্ধ কালে আবদ্ধ, না ইহার অন্য কোন অর্থ আছে? ভাই, এ বিষয়ে কোন কথা বলিতে ভয় হয়। কারণ এ বিষয়ে মানব জীবনের ইতিহাস যে সাক্ষ্যই প্রদান করুক না কেন, কবিদের একটি স্বতন্ত্র আদর্শ আছে। অন্ততঃ লিখিবার সময় তাহাই প্রকাশ পায়। তাহার কারণ বুঝাও আয়াসসাধ্য নহে। একানু-রক্তি বাস্তবিকই বড় সুন্দর। অনুরাগের লক্ষণই

তাই, ইহা অবস্থান্তর কল্পনা করে না। মানবাত্মা অনন্ত-উন্নতিশীল; অনন্তাভিমুখে তাহার স্বাভাবিক গতি। আজ যাহা কাহার অন্তরে সৌন্দর্য্যের আদর্শ বলিয়া প্রতিভাত হইল, আজ যাহা কাহার প্রাণে স্বর্গের ছবি আনিয়া দিল, তাহার চরণ তলে তাহার মন প্রাণ স্বতঃই অবনত হইল; কিন্তু চির দিন যে তাহা সেই ভাবে তাহাকে স্বর্গের পথে লইয়া যাইবে, তাহার নিশ্চয়তা কি? যদি দুটি প্রাণ প্রসারিত আদর্শের সহিত অনন্ত-উন্নতি-পথে অগ্রসর হইতে থাকে, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রেমও দিন দিন গাঢ়তর ও পবিত্রতর হইতে থাকিবে। তাহাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু যদি তাহাদের আদর্শ ভিন্ন-মার্গাবলম্বী হয়, যদি একজন স্বর্গরাজ্যের যাত্রিক হন, অপর সংসারের ভোগ বিলাসকেই জীবনের সার মনে করেন, তখনও কি দুজনের মধ্যে প্রেম থাকা সম্ভব? শ্রদ্ধাতেই প্রেমের উৎপত্তি, শ্রদ্ধাই প্রেমের প্রাণ। শ্রদ্ধা সম্ভবপর না হইলে, প্রেম কি কখনও সম্ভবপর হইতে পারে? জোর করিয়া শ্রদ্ধা বা প্রেম আনয়ন করা যায় না। প্রেম উপা-

সনা, পতিতোদ্ধার নহে। পতিতোদ্ধার স্বতন্ত্র কথা। এক জনের উপাস্য প্রেমপাত্র ভাঙ্গিয়া গেল বলিয়া কি তাহার প্রেমও অপ্রেমে পরিণত হইল? যাহা পবিত্র, তাহাও অপবিত্র হইয়া গেল? তবে বলিতে পার, সে কেন আবার প্রেমের কথা ভাবিবে?—উপাসনার কথা ভাবিবে? সে কি মৃত প্রেমের সমাধিস্থলে বসিয়া ধ্যান করিতে পারে না? খুব ভাল সন্দেহ নাই। কিন্তু যে উপাস্য, তাহার উপাসনার যে কি দোষ তাহা ত বুঝিতে পারি না। তবে এ সব স্থলে কর্ত্তব্য জ্ঞানই আমাদের একমাত্র নেতা। কর্ত্তব্যের আলো নয়নের অন্তরাল হইলে পদে পদে আমাদের পতিত হইবার সম্ভাবনা। প্রেম আমাদিগকে কর্ত্তব্য শিক্ষা দেয় যে স্থলে একটু প্রেম জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, সে স্থানেই নানা কর্ত্তব্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। নানা কারণে প্রেম বিলোপ হইতে পারে, কিন্তু কর্ত্তব্যের বিলোপ নাই। যে স্থলে প্রেম ও কর্ত্তব্য-জ্ঞান বিভিন্ন-মুখী, সে স্থলেই জীবন-প্রশ্নের জটিলতা বাড়িতে থাকে। প্রেম ও কর্ত্তব্য-জ্ঞানের সামঞ্জস্য

করিয়াই জীবন গঠন করিতে হইবে। আমার বিবেচনায় প্রেমের অনন্তভাব কালের উপর তত নির্ভর করে না, কিন্তু ভাবের গভীরতা ও পবিত্রতার উপরই নির্ভর করে। প্রেম যত গভীর ও বিশুদ্ধ হইবে, ততই তাহা আত্মাকে ভগবৎসন্নিধানে লইয়া যাইবে। অন্যান্য অবস্থা সমান থাকিলে কাল যে গভীরতার পরিমাপক তাহাতে সংশয় নাই। এবং এই জন্যই কালের সহিত প্রেমের অনন্তভাব এরূপ বিমিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন অন্যলোক ত আর অন্তর দেখে না, কাল লইয়াই তাহারা বিচার করে। একানুরক্তি অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়, কিন্তু তাহাও পৌত্তলিকতাতে পরিণত হইতে পারে। যে প্রেমের নাম সম্ভোগ বা সুখভোগ, তাহার প্রাণবিনাশী বিষের প্রতিবিধান করিবার জন্যই একানুরক্তির এত মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাকে প্রেম নাম দেওয়াই কি অন্যায় নহে? তবে অন্য লোকের পক্ষে এতদুভয়ের প্রভেদ করা সাধ্যাতীত। তাই এত গোলমাল। বিশুদ্ধ প্রেম কখনই আত্ম-বিরোধী নহে।”

আমি বলিলাম, "দাদা, আমার আর একটি কৌতূ-হল আছে, সেটি পূর্ণ কল্লে আমি বড় সুখী হই। আপনি কৈশোরে যাঁহার প্রেমে মাতিয়াছিলেন, তাঁহার সম্বন্ধে আপনার এখন কি ভাব?"

যো—"ভাই, এ বড় বিষম বিষয়। ঠিক বুঝিবে কি না বলিতে পারি না। ভুল বুঝিবার আশঙ্কা সমধিক। ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রেম চিরস্থায়ী। আমার যতটুকু প্রেম হইয়াছিল, তাহা কি গিয়াছে? আমার সেরূপ মনে হয় না। এক দিন একখানি স্বর্গের ছবি দেখিয়াছিলাম, সে স্মৃতি আজও এ হৃদয়ে বর্ত্তমান, এবং আশা করি চিরকালই থাকিবে। প্রেমের উচ্চতর আদর্শ প্রাণে জাগাতে সে স্মৃতি আরও মধুর ও পবিত্র হইয়াছে। আমার জীবনকে উচ্চতর সোপানে উঠাইবার তাহার যে শক্তি, তাহা পূর্ণভাবে আমার জীবনের উপর কার্য্য করিয়াছে ও করিতেছে। তবে সত্য বটে, তখন যে আকাঙ্ক্ষা প্রাণে জাগিয়াছিল, সে আকাঙ্ক্ষা আর নাই। তখন যে আকাঙ্ক্ষা প্রাণটাকে মাতাইত, আজ কাল প্রাণ আর তাহাতে মাতিতে পারে না: আজ

কাল উচ্চতর আকাঙ্ক্ষা প্রাণ অধিকার করিয়াছে। তখন যে ভাব হৃদয়টাকে উন্মত্ত করিয়াছিল, তাহা আমার জীবনটাকে যে কি পরিমাণে গঠিত করিয়াছে, তাহা কে নির্ণয় করিবে? তবে তাহার কি ক্ষয় হইয়াছে? তবুও তাঁহাকে ঠিক প্রেম বলা যায় কি না সন্দেহ। আমি একটি স্বর্গের ফুলের সৌরভে মাতোয়ারা হইয়াছিলাম বটে, কিন্তু প্রাণে প্রাণে মিশিয়াছিল কি? প্রকৃত সখিত্ব সংস্থাপিত হইয়াছিল কি? অনন্তের পথে হাত ধরাধরি করিয়া অগ্রসর হইতে পারিয়াছিলাম কি? ভাই, আমি এখনও বলিতেছি, প্রেম অমর, অক্ষর, অনন্ত। ইহার অধিক আর কিছু বলিতে পারি না।"

আমি তখন হৃদয়ে এ কথা ঠিক ধারণ করিতে পারিয়াছিলাম কি না সন্দেহ, তথাপি মনে হইল যেন বুঝিয়াছি। ও কথার উপর আমার কোন কথা আসিল না। আমি নানা কথা মনের মধ্যে আন্দোলন করিতে করিতে গৃহে ফিরিলাম।

৫

ইহার কিছু পরেই আমাকে একটি চাকরী লইয়া বিদেশে যাইতে হয়। কার্য্যোপলক্ষে আমাকে নানা দেশবিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত, কোন স্থানেই স্থির হইয়া এক সঙ্গে অধিক দিন থাকিতে পাইতাম না। কাজেই নানা অসুবিধার মধ্যে পড়িয়া দেশের সহিত প্রায় সমস্ত সম্বন্ধই বিচ্ছিন্ন করিতে হয়। প্রায় কাহারই সহিত পত্রাদি চলিত না। নিজের লেখার সুবিধা হইত না, অন্যের পত্র পাইবার সুবিধা তদপেক্ষাও কম। এই দীর্ঘকালের মধ্যে যোগনাথের দুখানি মাত্র পত্র আমার হস্তগত হয়। এক খানিতে তাঁহার বিবাহিত জীবনের সুখের সংবাদ পাই, অপর খানি একটি সুন্দর শিশু-জীবনে তাঁহাদের বর্দ্ধিত জীবন-স্রোতের সংবাদ

আমাকে প্রদান করে। কিন্তু কয়েক বৎসর পরে আবার যখন আমি গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম, তখন দেখিলাম যোগনাথের জীবনের সে সুখ-সূর্য্য অস্তমিত হইয়াছে, যোগনাথ আবার সংসারে একাকী। এ সংবাদ শুনিয়া আমার যে কি হইল তাহা বলিতে পারি না। অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলাম না। পরে যোগনাথকে দেখিতে গেলাম। সে বিষাদ-গম্ভীর মুখ দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইলাম, আমার যেন আর পা সরিল না। দৃষ্টি বাষ্পজালে আবরিত হইল। যোগনাথ আমার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, আমিও অনেক কাঁদিলাম। উভয়ের অশ্রুজলে উভয়ে স্নাত হইলাম। পরে অনেক শান্ত হইয়া যোগনাথ বলিলেন, "দেখ ভাই, দুর্ব্বল বলিয়া আমাকে অবজ্ঞা করিও না। আজ ছয় মাস হইল যাহাদের জন্য এই অন্ধকার জীবন আলোকিত হইয়াছিল, তাহারা আমাকে ফাঁকি দিয়া পলায়ন করিয়াছে। আমি আজ ছ মাস আপনার দুঃখ আপনি বহন করিয়াছি, এক দিনের জন্য চোকের

জল ফেলি নাই। কিন্তু যখন তোমাকে দেখিলাম, তখন আমার কি হইয়া গেল, আমি আর আপনাকে রক্ষা করিতে পারিলাম না। আমার এ প্রাণের যাতনা আর কে বুঝিবে? ভগবান্ই জানেন, আমি কি ভাবে এ দুঃখ বহন করিয়াছি। যদি তাঁহার আশ্রয় না পাইতাম, তাহা হইলে কখনই এ অসহ্য দুঃখভার বহন করিতে পারিতাম না। আমি এ বিধানের বিরুদ্ধে হস্তোত্তোলন করি না। করিলেই বা কি হইবে? আমার শক্তিহীন ইচ্ছা চূর্ণ হইয়া যাইবে না কি? এ বিধানের গূঢ় মর্ম্ম কি, তাহা মানব-জ্ঞানের অতীত বলিয়া বোধ হয়। তথাপি অবনত মস্তকে আমি এ বিধান গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু ভাই, হৃদয় বড় দুর্ব্বল, ব্যথা পাইলেই কাঁদে। তাহার উপর আমাদের কি হাত আছে?" কিছুকাল চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন। "মৃত্যুর পর পারে মানবাত্মার কি অবস্থা হয়, তাহা কিছুই জানিতে পারি না। যদি সে বিষয়ে কিছু জানিতে পারিতাম, তাহা হইলে হয়ত এ দুঃখ

বহন করা এত কষ্টকর হইত না। তবে আমাদের আশাই একমাত্র সম্বল। এই স্বর্গের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, এই অনন্ত-উন্নতিশীল মানবাত্মা এক দিনে নিবিয়া যাইবে, একথা, বিজ্ঞান যাহাই বলুক না কেন, বিশ্বাস করিতে যেন ইচ্ছা যায় না। যদি এখানেই ইহার শেষ হয়, তাহা হইলে যেন এ জীবন অর্থহীন বলিয়া বোধ হয়। এই যে সমস্ত চির-অতৃপ্ত প্রাণের গভীর আকাঙ্ক্ষা,—যে আকাঙ্ক্ষা শত যুক্তিতর্কেও নিবাইতে সমর্থ হয় না, যাহা জীবনের তুল্য গভীর, যাহা প্রাণে থাকিয়া আমাদিগকে পৃথিবীর সমস্ত পদার্থ হইতে আকর্ষণ করিয়া স্বর্গের অভিমুখে লইয়া যাইতেছে, যাহা আমাদিগকে অনন্তের সহিত যুক্ত করিয়া দিতেছে,—তাহা কি এক মুহূর্ত্তে শূন্যে মিলাইতে পারে? এ মীমাংসা কি কখনও আমাদের জ্ঞান পিপাসাকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে? কি জানি, কিছুতেই প্রাণ এ মীমাংসায় সায় দিতে চায় না। একি কুসংস্কার? হ'তে পারে। কিন্তু ভালবাসাটাও কি কুসংস্কার? তার কি কোন প্রমাণ আছে? তবে অবিশ্বাসের সীমা কোথায়?

আমরা যতই জ্ঞানের গর্ব্ব করি না কেন, আমাদের প্রাণের গভীর ভাব ও আকাঙ্ক্ষা তাহাকে অতিক্রম করিয়া ঊর্দ্ধে ধাবিত হয়। জ্ঞানের পদস্খলন সম্ভব, কিন্তু প্রাণের কোন গভীর ভাবই একেবারে ভ্রান্ত ইহা প্রমাণিত হয় নাই। ভাই, তুমি কি মনে কর না, যে আমাদের জীবন এখানেই শেষ হইবার নহে?"

আ—"আমি আর কি বলিব। আশা ছাড়িলে বাঁচিব কি রূপে? যদি পরকাল নাও থাকে, তাহা হইলেও পরকাল থাকা উচিত, এইরূপ মনে হয়। সর্ব্বত্রই দেখি, জীবনই সত্য, মৃত্যু জীবনের সোপান মাত্র। এস্থলেই কি তাহার বিপর্য্যয় হইবে?"

অপর একদিন নানা কথাবার্ত্তার পর,—এ সময় প্রায়ই মৃত্যু ও পরকাল লইয়াই কথা হইত,—যোগনাথ বলিলেন, সাধারণতঃ এই জগৎটা আমাদের নিকট একটা প্রকাণ্ড স্বপ্ন বলিয়া বোধ হয়। কত স্বপ্ন আসিতেছে, যাইতেছে,—কিছুই আমাদের অন্তরের উপর স্থায়ী ফল রাখিয়া যায় না। সরসীবক্ষে গম্যমান মেঘের প্রতিবিম্বের ন্যায় মুহূর্ত্তে

মুহূর্ত্তেই বিলীন হইতে থাকে। কিন্তু প্রেম আসিয়াই এই ছায়াকে সজীব করে, স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করে। প্রত্যহ কত লোক এ জগতে আসিতেছে, যাইতেছে, কিন্তু আমরা তাহা অনুভবই করিতে পারি না। কত লোককে ত চক্ষুর সমক্ষে জীবন-লীলা শেষ করিতে দেখিয়াছি; সে সমস্তই যেন নাট্যশালায় প্রদর্শিত মৃত্যুর ন্যায় পর মুহূর্ত্তেই বিস্মৃতি-সাগরে ডুবিয়াছে। কিন্তু মৃত্যু আসিয়া যখন আমাদের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইল, তখনই তাহার ভীষণ মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। মানবাত্মার অস্তিত্ব হৃদয়ঙ্গম করিলাম। এবার এ আর জলের প্রতিবিম্ব নহে যে মুহূর্ত্তে মিলাইয়া যাইবে, ইহাতে প্রাণ ভাঙ্গিয়া চূরমার হইয়া গেল। তখন বুঝিলাম, প্রেমই সকলের সার। যদি প্রেম না থাকিত, তাহা হইলে কখনই এই জগৎটাকে, এ মানব জীবনকে ভোজবাজী ভিন্ন আর কিছুই মনে করিতে পারিতাম না। যে যে পরিমাণে আমার প্রেম আকর্ষণ করিতে পারিয়াছে, সে সেই পরিমাণেই আমার নিকট সত্য হইয়াছে,

তদ্ভিন্ন আর সকলেই ছায়া মাত্র। প্রেমই সকল সত্যের সার সত্য। মৃত্যুই আমাদিগকে এই অমূল্য সত্য শিক্ষা দেয়। এখনই বিশেষ ভাবে বুঝিয়াছি, মৃত্যু আমার কি অমূল্য ধনই হরণ করিয়াছে! আমি এখনই দেখিতে পাইতেছি, তিনি আমার জগতের কতটা স্থান জুড়িয়া ছিলেন। আমি পূর্ব্বে ভাবিতাম, আমার কত শক্তি আছে, আমি কত কাজ করিতে পারি, আমি একাকী এ জগৎটাকে ভাঙ্গিয়া গড়িতে পারি, কিন্তু আজ দেখিতেছি, আমি কত দুর্ব্বল, আমি যে শিরার জোরে কাজ করিতাম তাহা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। আমি আর তাঁহাকে এ সংসারে দেখিতে পাই না বলিয়া প্রাণে অসহনীয় যাতনা হইতেছে বটে, কিন্তু তথাপি আমি মৃত্যুকে অমঙ্গল বলিয়া ভাবিতে পারি না। আমরা নিতান্ত বহির্ম্মুখী, তাই বোধ হয়, মুখ দেখিতে না পাইলে আমরা এত অস্থির হই। তিনি এত দিন আমার বাহিরে ছিলেন। আজ তিনি আমার অন্তরের অন্তরে আসিয়াছেন। তিনি অহর্নিশি আমার প্রাণের মধ্যে জাগিতেছেন। তিনি

যে আমার এত নিকট, তিনি যে এতটা 'আমার', তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না, বোধ হয় মৃত্যু দেখাইয়া না দিলে কখনও দেখিতেও পাইতাম না। যদি সে অপার্থিব ধন পঞ্চভূতে না মিশাইয়া থাকে, তাহা হইলে মৃত্যু আমার কি ক্ষতি করিয়াছে? বরং সে হৃদয়ধনের মর্য্যাদা বুঝাইয়া দিয়া কি বন্ধুর কার্য্যই করে নাই? বাস্তবিক, ভাই, যখন আমি এ সমস্ত বিষয় ভাবি, তখন মনে হয়, মৃত্যু কি বস্তুতই বড় সুন্দর নহে? আমরা অন্ধ, আমরা অবিশ্বাসী তাই এত কষ্ট পাই।"

আমি মনে মনে ভাবিলাম, "প্রেমই মৃত্যুঞ্জয় বটে। প্রেমিকই হলাহল পান করিয়া তাহা অমৃতে পরিণত করেন।"

অন্য এক সময় যোগনাথ কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন "মৃত্যু যে শুদ্ধ আমাকে প্রেম-মাহাত্ম্য বুঝাইয়া দিয়াছে, তাহা নহে; মৃত্যু আমাকে এই মানবজাতি প্রদান করিয়াছে। মনুষ্য মাত্র যে আমার এত আপনার; মানবের সেবা, মানবের জন্য পরিশ্রম করা যে এত সুখের, তাহা আমি

পূর্ব্বে কখনও জানিতাম না। এখন মনে হয় যেন আমার প্রাণময়ী সমস্ত মানবজাতিকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছেন। মানবের সেবা করিয়া মনে হয় আমি তাঁহারি সেবা করিতেছি। পূর্ব্বে যে সমস্ত কার্য্য করিতাম, তাঁহা পরোপকার করা হইত, কিন্তু আজ কাল ইহাকে সেবা বলিয়া মনে হয়। আজ কাল একটু কাজ করিতে পারিলে আপনি কৃতার্থ হইলাম বলিয়া মনে হয়। রমণীমুখে যেন সেই স্বর্গের ছবির প্রতিবিম্ব আসিয়া পড়ে, তখন রমণীর কোন প্রকার অবনতি অসহনীয় হইয়া উঠে। তখনও কি সে জন্য পরিশ্রম করা কষ্টকর হইতে পারে? সেই স্বর্গের তেজে যেন প্রাণ পূর্ণ হইয়া উঠে, অমিত তেজ হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। তিনি প্রকৃতই এখন আমার প্রাণের উৎসাহ, হৃদয়ের শোণিত, বাহুর বল হইয়াছেন। পরের সন্তান যে এত মিষ্ট হয়, তাহাও কখন পূর্ব্বে বুঝি নাই।”

যোগনাথ পূর্ব্বে এক সময়ে মৃত্যুকে সুন্দর বলিয়াছিলেন, আজ দেখিলাম, মৃত্যু প্রকৃতই বড়

সুন্দর। মৃত্যু না থাকিলে কথনও কি পৃথিবীতে স্বর্গের শোভা দেখিতে পাইতাম? কি আশ্চর্য্য! যে মৃত্যুকে প্রেমের পরম শত্রু বলিয়া বোধ হয়, তাহাই এ ভাবে প্রেমের পথ পরিষ্কার করিয়া দেয়, প্রেমে স্বর্গের মাধুর্য্য আনিয়া দেয়! জীবন ও মৃত্যু সহোদর। এই জন্যই আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ভগবানের সংহারমূর্ত্তিকেই সদাশিব নাম দিয়াছিলেন।

৬

আমাদের দেশে কত শত রমণী সমাজের নিষ্ঠুর ব্যবহারে, কেহবা অন্নাভাবে পাপপঙ্কে নিমজ্জিত হয়। কেহ হয়ত এক দিনের দুর্ব্বলতার জন্য নরকের গভীরতম কূপে ডুবিতেছে, কারণ তাহাকে হাত ধরিয়া ধর্ম্মের পথে লইবার কেহ নাই। যে সমস্ত পুরুষের দুর্ব্বলতাবশতঃ এক দিন ধর্ম্মপথ হইতে পদস্খলন হইয়াছে, তাহারা যদি আর কথনও সমাজে স্থান না পাইতেন, তাহাদিগকে যদি ভাল হইবার সুবিধা দেওয়া না হইত, তাহা হইলে যে সকল লোক আজ কাল সমাজে ধর্ম্মের পরিপোষক হইয়া রহিয়াছেন, যাহারা লোক সাধারণের শ্রদ্ধা ভক্তি লাভ করিতেছেন, তাহাদের ক'জন এস্থান অধিকার করিতে পাই-

তেন ? কিন্তু রমণীর পক্ষে অন্য ব্যবস্থা। তিনি এক দিন কোন অন্যায় কার্য্য করিলে, তাহার আর রক্ষা নাই ; তাহাকে দিন দিন পাপের নিম্নতর গর্ভে ডুবিতে হইবে, তিনি আর সে স্থানেও থাকিতে পারেন না। যে পুরুষ তাহাকে এ অবস্থায় পাতিত করিল, তিনি সমাজে আদৃত হইলেন। তিনিই হয়ত আবার নির্য্যাতন দণ্ড স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। যদি কেহ পুনরায় ধর্ম্মপথে আসিতে চাহে তাহারও কোন ব্যবস্থা নাই। যোগনাথের হৃদয় এই সমস্ত অনাথা রমণীদের জন্য কাঁদিল, তিনি প্রাণপণে তাহাদের উদ্ধারার্থ অকাতরে পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। একটি অনাথাশ্রম খুলিয়া তাহাদিগকে ধর্ম্মপথে আনয়ন করা, তাঁহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা। অহর্নিশি অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতে করিতে তাহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল। তথাপি তাঁহার বিশ্রাম নাই, সেই অসুস্থ শরীর লইয়াই তিনি খাটিতে লাগিলেন। বন্ধুবান্ধবেরা তাঁহাকে কত নিষেধ করিতেন, কিন্তু তিনি কাহারও কথাতেই ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। তিনি গভীর নিদ্রাতেও যেন অনা-

থাদের গভীর মর্ম্মভেদী তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস শুনিতে পাইতেন, তাঁহার প্রাণ অস্থির হইত। তখনও কি তাঁহার প্রাণে আপনার সুখশান্তির কথা আসিতে পারে? তিনি সিংহবিক্রমে পাপের রাজ্য ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার মনের তেজ পড়িল না বটে, কিন্তু তাঁহার ভগ্নদেহ সে ভার বহন করিতে সমর্থ হইল না। তিনি সঙ্কট পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন। আমি সে সময় বিদেশে। এ সংবাদ পাইয়াই গৃহে ফিরিলাম। এ সময় আমাকে পাইয়া যোগনাথ বড় সুখী হইলেন। আমি সর্ব্বদা সেই পবিত্র রোগশয্যা পার্শ্বে বসিয়া থাকিতাম। রোগের অসহ্য যন্ত্রণা তিনি অম্লানবদনে সহ্য করিতেন। সে মুখের সদাপ্রফুল্ল ভাব কিছুতেই যাইত না। বরং যেন বৃদ্ধিই পাইয়াছিল। তিনি আমাকে একদিন বলিলেন, তিনি আর এ রোগশয্যা হইতে উঠিবেন না। মৃত্যুর নামে তাঁহার মুখে কখনও বিষাদ-চিহ্ন পরিলক্ষিত হইত না, বরং আনন্দই প্রকাশ পাইত। তবে মধ্যে মধ্যে তাঁহার আরব্ধ কার্য্য শেষ হইল না বলিয়া আক্ষেপ করিতেন;

কিন্তু আবার বলিতেন, যাঁহার কার্য্য তিনিই করিয়া লইবেন। প্রয়োজন হইলে, প্রস্তর হইতেই তিনি আপন সেনা প্রস্তুত করিয়া লইতে পারেন।

তাঁহাকে দেখিয়া আমি মৃত্যুর ভীষণ মূর্ত্তি ভুলিয়া গিয়াছিলাম। এ সময়ে তিনি সর্ব্বদাই জীবন ও ধর্ম্ম সম্বন্ধেই আলোচনা করিতেন। যে সমস্ত গভীর তত্ত্বের কথা বলিতেন আমি তাহা মুগ্ধের ন্যায় শ্রবণ করিতাম। মৃত্যুর সান্নিধ্যহেতু যেন তাঁহার দিব্যচক্ষু ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সন্দেহের ছায়া যেন সে হৃদয় হইতে চলিয়া গিয়াছিল। তাঁহার কথা শুনিতে শুনিতে আমারও হৃদয়ের অন্ধকার কাটিয়া গেল, আমিও ধর্ম্মের জীবন্ত ভাব দেখিয়া কৃতার্থ হইলাম। তিনি যে সমস্ত তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহা এখনও আমার হৃদয়ে গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে, তাঁহার সে সুমধুর কণ্ঠস্বর এখনও যেন আমার অন্তঃকর্ণে বাজিতেছে। আমার নিকট বিভিন্ন সময়ে বিবৃত তাঁহার সে তত্ত্বগুলি এই :—“ভাই, অত্যন্ত বাল্যকাল হইতেই কতক গুলি সন্দেহ প্রাণকে আন্দোলিত করিয়াছে, আজী-

বন তাহার অনুসরণ করিয়াছি। কৃতকার্য্য হই-
য়াছি কি? তাহা ঠিক বলিতে পারি না। কত
সন্দেহ মিটিয়াছে, কত বা নূতন সন্দেহ মন অধি-
কার করিয়াছে। কোথায়ও আলোক, কোথায়ও
অন্ধকার, আবার কোথায়ও বা কুয়াসার ন্যায়
আলোকান্ধকার বিমিশ্রিত রহিয়াছে। কোন
সময়ে বা নিরাশার অবসাদে জীবন্মৃত হইয়াছি,
কখনও বা আশায় অনন্তকেও করতলগত বলিয়া
মনে করিয়াছি। কখনও হর্ষ, কখনও বিষাদ
জীবনটাকে বৈচিত্র্যময় করিয়াছে। কিন্তু জয়
পরাজয়ের অর্থ কি? আমার জীবন যত শেষ হইতে
যাইতেছে, ততই যেন নূতন আশা প্রাণে জাগি-
তেছে। যদি প্রাণপণে সত্য লাভের জন্য চেষ্টা
করিয়া থাকি, যদি সুন্দরের প্রেমে প্রাণটাকে
মাতাইতে পারিয়া থাকি, যদি আমার প্রাণকে সুন্দর
করিতে স্বতঃ পরতঃ যত্নবান্ হইয়া থাকি, জগতের
সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত করিতে আমার ক্ষুদ্র শক্তিকে
নিয়োজিত করিয়া থাকি,—তাহা হইলে পরাজয়ে
দুঃখ কি? চেষ্টাতেই জীবন। মৃত্যু যতই নিকট

হইতেছে, ততই মনে হইতেছে, আত্মা অজর, অমর। লোকে ইহাকে কুসংস্কার বলিতে পারে, কিন্তু তাহাতে আমার কি? আমার নিকট এখন জীবন সুন্দর, মৃত্যুও সুন্দর। সুন্দরই শুদ্ধ সুন্দর যাহা তাহা বুঝিতে পারে। অন্যের কষ্টিপাথরে ইহার বিচার করিলে চলিবে কেন? আমরা গোলাব ফুলকে সুন্দর বলি, কিন্তু যাহার সৌন্দর্য্য বোধ নাই, তাহাকে কি এ সৌন্দর্য্য বুঝাইয়া দেওয়া যায়? কোন্ দর্শনশাস্ত্র তাহা পারিয়াছে? জীবন সুন্দর, সুতরাং জীবন অমর। জীবন আপনিই আপনার কষ্টিপাথর। জীবন বলে, 'আমি অমর,' আমাদের প্রাণ অমনই আনন্দে নাচিয়া উঠে। এতদ্ভিন্ন আর কি প্রমাণ সম্ভব হইতে পারে? যে আপনার জীবনকে সুন্দর বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছে, আত্মার অনন্ত সৌন্দর্য্য যাহার অন্তরে ফুটিয়া উঠিয়াছে, সে মৃত্যুর হাত এড়াইয়াছে, সে অজর, অমর হইয়াছে।

"তুমি ভাই, ধর্ম্মের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ। এ সম্বন্ধে কোন কথা কহিতে যেন সাহস হয় না।

কি বলিব? অনন্ত সম্বন্ধে আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞান কতটুকু জানে? তবে যাহা নিজের জীবনে অনুভব করিয়াছি, তাহা বলিতেছি। তুমিত, ভাই, জানই, আমি কি ভাবে ভগবান্‌কে অতি-জাগতিক কল্পনা করিয়া সৃষ্টির অতীত রাজ্যে যাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, এবং তাহার কিরূপ পরিণতি হইয়াছিল। তখন মনে করিতাম, জীবন ও ধর্ম্ম স্বতন্ত্র। কিন্তু এখন সেরূপ মনে হয় না। জীবনকে ধর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্র মনে করা দূরে থাকুক্, এখন জীবনকেই প্রকৃত ধর্ম্ম বলিয়া মনে হয়। ভগবান্‌কে আর অতি-জাগতিক কল্পনা করিতে পারি না। কিন্তু তিনিই প্রাণরূপে এই জগতের মূলে অবস্থিত, এই জগত তাঁহারই বহির্বিকাশ মাত্র। তিনি বিশ্বরূপ। এক হইয়াও তিনি আপনাকে বহুভাবে প্রকাশ করিয়া পুনরায় আপনাতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। তিনি 'এক' হইয়াও 'বহু' এবং 'বহু' সেই একেরই অন্বেষণ করিতেছে। এ 'এক' এবং 'বহু'র মধ্যে প্রতিকূলতা নাই, কিন্তু এখানে একের 'অন্তরেই' বহু এবং বহুর 'অন্তরেই'

একের কার্য্য। মূলে 'এক' না থাকিলে 'বহু' সম্ভব হইতে পারে না, এবং বহুত্ব-বিবর্জ্জিত 'এক' সম্পূর্ণ অর্থহীন। এই জন্যই ভগবান্ আমার প্রাণের প্রাণ, আমার প্রকৃত 'আমি', অথচ তাঁহাতে ও আমাতে এত পার্থক্য। তিনিই আমি, আমিই তিনি, অথচ তিনি অনন্ত, আমি সান্ত,—তিনি পূর্ণ, আমি চির-অপূর্ণ—তিনি নিত্য সত্য, অনন্ত-জ্ঞানময়, আমি অসৎ, অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন জীব-মাত্র,—তিনি অপাপবিদ্ধ, আমি পাপকলুষিত,—তিনি চিরসুন্দর, আমি শুদ্ধ সৌন্দর্যের ভিখারী, সৌন্দর্য্যের উপাসক। সান্ত অনন্তের এই নিত্য সম্বন্ধ আছে বলিয়াই জ্ঞান সম্ভব হইতেছে, প্রেম-ভক্তি সম্ভব হইতেছে। অনন্ত আপনাকে সান্তের মধ্যে হারাইয়া আপনাকে অন্বেষণ করিতেছেন। অনন্তের অন্বেষণ, অনন্তকে লাভ করাই সান্তের চরম লক্ষ্য, তাহাতেই তাহার চিরআনন্দ, নিত্য শান্তি। ইহারই নাম ধর্ম্ম এবং ইহাই আমাদের জীবন। এই অনন্তকে লাভ করিবার পক্ষে যাহা কিছু উপকরণ, সে সমস্তই সান্তের অন্তরে বর্ত্তমান।

'সত্যং শিবং সুন্দরং'—ইহাতেই সেই অনাদি পুরুষের সমস্ত ভাব প্রকাশ পাইতেছে। তাঁহার অনন্ত সৎস্বরূপ জানিবার জন্য আমাদের অন্তরে অনন্ত জ্ঞান-পিপাসা রহিয়াছে এবং ইহার লক্ষ্যস্থলে এক অনন্ত জ্ঞানের আদর্শ বর্ত্তমান। কিন্তু জ্ঞান তাঁহার আকার (Form), অনন্ত সৌন্দর্য্যই তাঁহার প্রকৃত সত্বা (Content)। ভগবান্ আপন পূর্ণতাতে নিত্য সত্য, পরম সুন্দর। অনন্ত জ্ঞানময় সুন্দর পুরুষের আত্মবিকাশেই এই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। সৌন্দর্য্যই জগতের চরম লক্ষ্য। সেই অনন্ত সুন্দরের ক্রমিক আত্মানুভূতিতেই, যাহা আদর্শ মাত্র তাহাকে ক্রমশঃ জীবনে পরিণত করাতেই, এই জগদ্বিবর্ত্তন ঘটিতেছে। জগদ্বিবর্ত্তনে তাঁহার সেই অনন্ত সৌন্দর্য্য এক দিকে প্রকৃতির মুখে অসংখ্যভাবে ফুটিয়া উঠিতেছে, অন্য পক্ষে মানবাত্মাতে বিশেষভাবে সে সৌন্দর্য্য পরিস্ফুট হইয়া মানবকে অনন্ত আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য্যের অধিকারী করিতেছে। কিন্তু এই বিবর্ত্তনের রাজ্যে সান্ত অনন্তাভিমুখী, অপূর্ণ পূর্ণের জন্য লালায়িত।

সুতরাং এ রাজ্যে নিত্য অভাব ও নিত্য চেষ্টা। এই জন্যই এ রাজ্যে সৌন্দর্য্যের পূর্ণতা নাই, কারণ পূর্ণতাতেই সৌন্দর্য্য ; কিন্তু সৌন্দর্য্যের জন্য অনন্ত পিপাসা বিদ্যমান। ইহাই মানবের প্রধান গৌরব। সান্ত জীবনে অনন্ত সৌন্দর্য্য আনিতে হইবে, তজ্জন্য অনন্ত চেষ্টা করিতে হইবে, এতদপেক্ষা মহত্তর লক্ষ্য কি হইতে পারে? আমাদের অন্তরে এই অনন্ত সৌন্দর্য্যের আদর্শ ক্রমশই প্রকাশ পাইতেছে, এই অনন্ত সুন্দরকে জীবনে লাভ করিবার জন্য আমাদের প্রাণ সর্ব্বদাই উন্মুখ, সর্ব্বদা লালায়িত। আমরা সান্ত জীব, কিন্তু আমাদের প্রাণে এই যে অনন্তের আদর্শ, এই যে অনন্ত আকাঙ্ক্ষা, ইহাতেই আমাদিগকে অনন্তের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিতেছে। সাক্ষাৎ-ভাবে আমরা অনন্তকে ধরিতে না পারিলেও এই অনন্ত আকাঙ্ক্ষা অনন্ত স্বরূপ ভগবানকে লাভ করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর করিয়া দিতেছে, আমরা অনন্তকাল ধরিয়া তাঁহারই অভিমুখে গমন করি-তেছি, তাঁহারই অনন্ত সৌন্দর্য্য দিন দিনই লাভ করিতেছি। সৌন্দর্য্যের প্রতি প্রাণের যে একান্ত

অনুরাগ, তাহাকেই প্রেম বলে। প্রেমই সকলের সার, প্রেমেতেই সকল বস্তুর সারত্ব। সৌন্দর্য্য অনন্ত, সুতরাং প্রেমও অনন্ত। অনন্ত সৌন্দর্য্য না হইলে প্রেম কখনই পরিতৃপ্ত হয় না। সৌন্দর্য্যের পূর্ণ পরিণতিই জগৎসৃষ্টির লক্ষ্য, সুতরাং প্রেমেতেই জগৎ উৎপন্ন। প্রেমই সারাৎসার। আমরা সান্ত, কিন্তু সৌন্দর্য্য অনন্ত, সৌন্দর্য্যই পরম কাঙ্ক্ষনীয়, পরম শিব। সান্ত হইয়া এই অনন্ত সৌন্দর্য্য লাভ করিবার জন্য যে আকাঙ্ক্ষা, যে উদ্যম, যে চেষ্টা, তাহাতেই আমাদের প্রকৃত জীবন; এবং ইহাই ধর্ম্ম। ভগবান্ স্বয়ং অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত সুন্দর। কিন্তু আমরা অপূর্ণ জীব, তাঁহার অনন্ত সৌন্দর্য্য আমাদের আকাঙ্ক্ষার বিষয়, তাহা শুদ্ধ আমাদের আদর্শেই বর্ত্তমান। এই ভাবে আমাদের আকাঙ্ক্ষার বিষয় হওয়াতেই তিনি আমাদের নিকট পরম শিবরূপে প্রকাশিত। এই সান্তের রাজ্যে সেই পরম শিবসুন্দরের বিকাশ হইতেছে, তিনিই সৃষ্টির মূলে থাকিয়া শক্তিরূপে কার্য্য করিতেছেন, এবং এই জাগতিক পরিণামকে ক্রমশঃ উচ্চ হইতে

উচ্চতর অবস্থায় লইয়া যাইতেছেন। মানবাত্মায় ও জনসমাজে শিবসুন্দরের ক্রমিক বিকাশেই সৃষ্টির চরম লক্ষ্য সংসাধিত হইতেছে, এবং মানব দিন দিন উৎকর্ষ লাভ করিয়া সত্য-শিব-সুন্দরের সিংহা-সনতলে যাইয়া উপনীত হইতেছে।

অন্য পক্ষে জ্ঞানকে আশ্রয় না করিয়া কিছুই দাঁড়াইতে পারে না। জ্ঞান সকলের মূলাধার। ভগবানের অনন্ত জ্ঞানও জগদ্বিবর্ত্তনে অল্পে অল্পে আপনার অনন্ত সত্তা প্রকাশিত করিতেছেন। জ্ঞান ছাড়িয়া সৌন্দর্য্য নাই, সৌন্দর্য্য ছাড়িয়াও জ্ঞান থাকে না। সুতরাং জীবনে অনন্ত সৌন্দর্য্য লাভ করিতে হইলে, এই জীবনও জগৎকে প্রকৃত-ভাবে সুন্দর করিতে হইলে, অনন্ত জ্ঞানও লাভ করিতে হইবে। কিন্তু সান্ত মানবকে অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত সৌন্দর্য্য লাভ করিতে হইলে, অনন্ত চেষ্টা করিতে হইবে। এবং এই চেষ্টাই আমাদের প্রকৃত জীবন। যে মুহূর্ত্তে এই অনন্ত জ্ঞান ও সৌন্দর্য্যের জন্য আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টার বিরাম হইল, সেই মুহূর্ত্তেই জীবনগতিও বিরত হইল।

আমাদের প্রাণের গভীরতম আকাঙ্ক্ষাগুলি এই পথই প্রদর্শন করিতেছে। এ বিশ্বের সর্ব্বত্রই সৌন্দর্য্য ফুটিয়া পড়িতেছে, তাহার কোন্ সৌন্দর্য্য কণিকা আমাদের অবহেলার বিষয়? কোন্ জ্ঞান বিন্দু সেই অনন্ত জ্ঞানের স্বরূপ প্রকাশ করিতেছে না? এই অনন্ত সত্য, সুন্দর পুরুষকে লাভ করিতে হইলে, এই বিশ্বের সমস্ত জ্ঞান, সমস্ত সৌন্দর্য্য প্রাণে লাভ করিতে হইবে।

কিন্তু কি উপায়ে ইহা লাভ করা সম্ভব? অনন্ত আকাঙ্ক্ষা, অনন্ত চেষ্টা। সত্যের জন্য, সুন্দরের জন্য অনন্ত আকাঙ্ক্ষা, অনন্ত পিয়াস থাকা একান্ত আবশ্যক এবং তজ্জন্য অবিশ্রান্ত চেষ্টা করিতে হইবে। এই চির-অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাই আমাদের প্রাণ এবং চেষ্টাই ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল। আলস্যই মৃত্যু। Blessed are they that hunger and thirst after Righteousness, for they shall be filled. যেখানে আকাঙ্ক্ষা, সেখানেই তাহার পরিতৃপ্তি। এই আকাঙ্ক্ষাই প্রকৃত প্রার্থনা, এই চেষ্টাই প্রকৃত উপাসনা। যে জীবনে এ প্রার্থনা

ও এ উপাসনা নাই, তাহাতে শ্মশানের বীভৎস আলো ও অন্ধকার, প্রকৃত জীবন সেস্থলে নাই। এ ভজন সাময়িক হইলে চলিবে না, দেশে কালে বদ্ধ হইলে চলিবে না। অবিরাম অবিশ্রাম গতিতে ইহার কার্য্য হওয়া চাই। যদি এক মুহূর্ত্তের জন্যও অনন্ত সত্যের আলো, অনন্ত সৌন্দর্য্য চক্ষুর অন্তরাল হয়, তাহা হইলেই জীবনে সে মুহূর্ত্তের জন্যও মৃত্যুর ছায়া পতিত হইল। এই বিচিত্র জগৎ, এই মানব সমাজ, এই অতলস্পর্শী মানব জীবন, সেই পরম সুন্দরেরই লীলাক্ষেত্র। ইহা পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোথায়ও তাঁহার অন্বেষণ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। এই জগৎ ও জীবনেই তাঁহার অনন্ত সৌন্দর্য্যের অন্বেষণ করিতে হইবে, আমাদের আত্মাকেই বিশেষভাবে সেই অনন্ত সৌন্দর্য্যের লীলাক্ষেত্র করিতে হইবে। প্রেম ও ভগবদ্ভক্তিই এই সৌন্দর্য্যোপাসনার চরম ফল, এখানেই মানবাত্মার পরম পরিতৃপ্তি। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে কখনই ইহা পর্য্যবসিত হইতে পারে না। যিনি প্রকৃত প্রস্তাবেই পরম সুন্দর,

যিনি তাঁহার উপাসক, তিনি কখনই যাহা কদর্য্য, যাহা কুৎসিৎ তাহা সহ্য করিতে পারেন না। যত দিন না এ সংসার হইতে সৌন্দর্য্য-বিঘাতক সমস্ত ব্যাধি বিদূরিত হয়, সমস্ত মানবজীবন সুন্দর হয়, তত দিন তিনি কখনই সুস্থির হইতে পারেন না। যত দিন না পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য স্থাপিত হয়, সমস্ত পৃথিবী স্বর্গের শোভায় শোভিত হয়, তত দিন তাঁহার কার্য্যের শেষ নাই, তাঁহার চেষ্টার শেষ নাই, তাঁহার পরিশ্রমের অবসান নাই। এবং ইহাতেই তাঁহার জীবনে সৌন্দর্য্যের ফুল পূর্ণ বিকশিত হইয়া উঠে। পরমসুন্দর যে জগদ্বিবর্ত্তনে আপনার অপার সৌন্দর্য্য বিকাশ করিতেছেন, সেই বিবর্ত্তনে অনন্তের হস্তস্থিত উপকরণ হওয়াতেই এ মানব জীবনের সার্থকতা। আমাদের জীবনকে একান্তভাবে তাঁহার ইচ্ছার অনুগত করিয়া দিতে হইবে, এ জীবনকে বিধাতার অন্তরস্থিত নির্ম্মল আদর্শের প্রবহণ স্বরূপ করিতে হইবে, এ জীবনে তাঁহার স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। ইহাই জীবনের চরম লক্ষ্য, ইহাই সার ধর্ম্ম।"

যোগনাথ দিন দিন শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইতে লাগিলেন, রোগ যন্ত্রণা আরও বাড়িল। কিন্তু তাঁহার মুখের কান্তি যেন কিছুমাত্র ম্লান হইল না। তিনি হাসি মুখেই যেন এ সংসার হইতে বিদায় লইলেন। মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে মুখে একটু সুমধুর হাসি দেখা দিল। তিনি যেন কোন সুমধুর আহ্বান শুনিতে পাইলেন, অতি অস্পষ্টভাবে বলিলেন "যাই"। তার পর কোন্ মুহূর্ত্তে যে তাঁহার শেষ নিশ্বাস বায়ু সে দেহ-পিঞ্জর ছাড়িল, তাহা বুঝাই গেল না, তিনি যেন মহা শান্তিতে নিদ্রা যাইতেছিলেন।

যোগনাথ এ সংসার হইতে চলিয়া গিয়াছেন, আমার জীবনের প্রধান আশ্রয় সরিয়া গিয়াছে। তাঁহার এক একটি কথা এ দুর্ব্বল হৃদয়ে বল সঞ্চার করিত, কিন্তু আজ আমি বন্ধুহীন। তাঁহার কোন বন্ধুর প্রয়োজন ছিল না, তিনি স্বয়ং জীবন সংগ্রামে বিজয়ী। কিন্তু আমার ন্যায় দুর্ব্বলের উপায় কি? তাই তাঁহার এ সংক্ষিপ্ত বিবরণী লিখিলাম, যদি ইহা পাঠ করিয়া সময় সময় হৃদয়ে বল পাই।

যোগনাথ যে বয়সে জীবন-লীলা শেষ করিয়াছেন, সে সময় অনেকের জীবন আরম্ভ হয়। কিন্তু সময়ই কি জীবনের পরিমাপক? তিনি এই অল্প বয়সে যে জ্ঞান, যে জীবন লাভ করিয়াছিলেন, তাহা ক'জনের দীর্ঘ জীবনে ঘটিয়া থাকে? তাঁহাকে অনেকেই অবিবেচক মনে করিতেন, বড় ভাবপ্রবণ বলিয়া ভাবিতেন, কিন্তু অবিবেচক কে? যোগনাথ, না তাঁহার বিচারকেরা? তিনি আপন প্রাণের গভীর ও মহৎ ভাবকে বিশ্বাস করিয়া, তাহাদের অনুযায়ী জীবন যাপন করিয়া, অমর জীবন লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু কত শত লোক যে আপনাদের গর্ব্বিত বিষয় বুদ্ধির অনুগত হইয়া অমর জীবনের পরিবর্ত্তে সংসারের ধূলা ক্রয় করিয়াছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? স্বর্গের মাদকতা না হইলে কেহ কখনও হিসাব কিতাব করিয়া স্বর্গরাজ্য লাভ করিতে পারে না। সংসারের গণিত শাস্ত্র সে রাজ্যে চলে না। সে রাজ্যে যাইতে হইলে মহৎ ভাবের স্রোতে 'আমি' কে ডুবাইতে হইবে।

না মরিলে কেহ কখনও নব জীবন লাভ করিতে পারে না।

সমাপ্ত।